মার্চ ২০২৩

মীর রেজাউল করিম কর্তৃক ৩৮, ডা. সুরেশ সরকার রোড,
পশ্চিম ব্লক (দ্বিতীয় তল), কলকাতা-৭০০০১৪ থেকে প্রকাশিত

Al-Ameen Mission

Regd. Office: Khalatpur, Udaynarayanpur, Howrah, Ph.: 74790 20059
Central Office: 53B Elliot Road, Kolkata 700 016, Ph.: 74790 20076

SUCCESS AT A GLANCE : 2020

Dazzling Record in NEET (UG)

Marks 626 & above Within AIR 9908 — 61	Marks 600 & above Within AIR 20174 — 134	Marks 580 & above Within AIR 30431 — 238
Marks 565 & above Within AIR 39289 — 322	Marks 550 & above Within AIR 49260 — 434	Marks 536 & above Within AIR 59825 — 516

AIR 916 (675)
Jisan Hossain

AIR 1276 (670)
Tanbir Ahmed

AIR 1522 (666)
Md Samim

AIR 1982 (662)
Ayesha Khatun

AIR 2298 (660)
Al Taufeeq

AIR 2817 (656)
Kanen Akhtar

AIR 2947 (655)
Md Tarig Sk

Higher Secondary (12th) Examination

Board		Appeared	90%	80%	70%	60%
WBCHSE	Science	2090	909	1928	2072	2089
	Arts	79	43	66	78	79
CBSE	Science	54	8	24	43	54
	Total	2223	960	2018	2193	2222

Appeared 2223	
From Poor & BPL families	605 (27%)
From lower-middle income group	775 (35%)
From middle & upper middle income group	843 (38%)

81 students have occupied their positions within 20 ranks in the H.S. exminations of the Council

2nd 498 (99.6%) Md Talha

7th 493 (98.6%) Shayma Sultana

9th 491 (98.2%) Qaseed Akhtar

9th 491 (98.2%) K Abdul Halim

9th 491 (98.2%) Junaid Ahmmed

Secondary (10th) Examination

Board		Appeared	90%	80%	70%	60%
WBBSE	Boys & Girls	1706	461	1211	1557	1668
CBSE	Boys & Girls	71	21	48	64	70
	Total	1777	482	1259	1621	1738

Appeared 1777	
From Poor & BPL families	627 (35%)
From lower-middle income group	680 (38%)
From middle & upper middle income group	470 (27%)

15 students have occupied their positions within 20 ranks in 10th exam.

7th 686 (98%) S Md Tameem

8th 685 (97.9%) Md Tahsincraman

15th 678 (96.7%) Mir Moosumi

16th 677 (96.7%) Sk Atiulla

17th 676 (96.6%) Sk Tafhim

To prepare yourself as an Ideal Teacher,

Join our Institutions...

M.R. COLLEGE OF EDUCATION

(B.Ed. & D.El.Ed.)

Recognized by- NCTE, Govt. of India.
Affiliated to the WBUTTEPA & WBBPE.

BIRA, BALISHA, P.S- ASHOKNAGAR, (N) 24 PGS, WB-743234
www.mcrtrust.org, Email- mcrtrust2012@gmail.com
Phone- (03216)-261082, Mobile- 9933863040

SAHAJPATH

(B.Ed. & D.El.Ed.)

Recognized by- NCTE, Govt. of India.
Affiliated to the WBUTTEPA & WBBPE.

BIRA, BALISHA, P.S- ASHOKNAGAR, (N) 24 PGS, WB-743702
www.sahajpath.org.in, Email- sahajpath2008@gmail.com
Phone- (03216)-260858, Mobile- 9932563040

MOTHER TERESA INSTITUTE OF EDUCATION & RESEARCH

(B.Ed. & D.El.Ed.)

Recognized by- NCTE, Govt. of India.
Affiliated to the WBUTTEPA & WBBPE.

NADIHIRAG, P.O- KAZIPARA, P.S- MADHYAMGRAM, (N) 24 PGS, KOL-125
www.mtiec.in, Email- secretary.mother@gmail.com
Mobile- 9051073449

DR. SHAHIDULLAH INSTITUTE OF EDUCATION.

(B.Ed. & D.El.Ed.)

Recognized by- NCTE, Govt. of India.
Affiliated to the WBUTTEPA & WBBPE.

AMINPUR, P.O- SONDALIA, P.S- SASHAN, (N) 24 PGS, WB-743423
www.dsie.in, Email- secretary.dsie@gmail.com
Mobile- 9051072035

Founder
Dr. Jahidul Sarkar
Mobile- 9734416128 / 7001575522

মাসিক

উজ্জীবন

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ-এর মুখপত্র

মার্চ ২০২৩
কলকাতা

কলকাতা আলিয়া সাংস্কৃতিক সমিতি (S0033754 of 2022-2023, 06-02-2023*)*

সদস্যবৃন্দ : অলিউল্লাহ সরকার, আনোয়ার সাদাত হালদার, আমজাদ হোসেন (সভাপতি), আলিমুজ্জমান, ইনাস উদ্দীন, একরামুল হক সেখ, জাহির আব্বাস, মহিউদ্দিন সরকার, মীর রেজাউল করিম (কোষাধ্যক্ষ), মুহম্মদ আফসার আলি, রমজান আলি, রবিউল ইসলাম, শেখ কামাল উদ্দীন, সাইফুল্লা (সম্পাদক), সামশুল আলম, সামসুল হালসোনা, শেখ হাফিজুর রহমান, হাসিবুর রহমান

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ (***কলকাতা আলিয়া সাংস্কৃতিক সমিতি-র অধীনস্থ সংস্থা)***

সভাপতি : আমজাদ হোসেন

সম্পাদক : সাইফুল্লা

কোষাধ্যক্ষ: মীর রেজাউল করিম

উজ্জীবন

সম্পাদক : সাইফুল্লা

নির্বাহী সম্পাদক : ইনাস উদ্দীন, জাহির আব্বাস

সম্পাদক মণ্ডলী : অনিকেত মহাপাত্র, আজিজুল হক, আবু রাইহান, আমিনুল ইসলাম, তৈমুর খান, পাতাউর জামান, ফারুক আহমেদ, মীজানুর রহমান, মুসা আলি, মুহম্মদ মতিউল্লাহ, শেখ হাফিজুর রহমান, সাজেদুল হক, সুজিতকুমার বিশ্বাস

উপদেষ্টা মণ্ডলী : আলিমুজ্জমান, খাজিম আহমেদ, জাহিরুল হাসান, মিলন দত্ত, মীরাতুন নাহার, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, লোকমান হাকিম, সামশুল আলম, স্বপন বসু

প্রচ্ছদ : প্রিয়ব্রত ভাণ্ডারী (**নাম-লিপি :** সম্বিত বসু)
বর্ণ সংস্থাপন : বর্ণায়ন
বিনিময় : ৫০ টাকা

যোগাযোগ : ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯, ৯৪৩৩৬১১৬৩৭

ই মেল : ujjibanmag@gmail.com, aliahsanskriti@gmail.com

ই মেল এ লেখা পাঠান অথবা ব্যবহার করুন এই ঠিকানা :

মীর রেজাউল করিম, ৩৮ ডা. সুরেশ সরকার রোড, পশ্চিম ব্লক (তৃতীয় তল), কলকাতা-১৪

প্রাপ্তিস্থান (কলকাতা) : অপূর্ব, ধ্যানবিন্দু, নিউ লেখা প্রকাশনী, পাতিরাম, বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, মল্লিক ব্রাদার্স

'উজ্জীবন' আলিয়া-র পরিবর্তিত নাম

সংসদ-সংবাদ

১। পূর্ব পরিকল্পনা মতো ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, উর্দু একাডেমি সভাঘরে অনুষ্ঠিত হয়েছে মরহুম আবদুর রাউফ এর স্মরণে আলোচনাসভা। সভায় সূচকভাষণ হিসাবে 'আবদুর রাউফ ও তাঁর সমকাল' বিষয়ে সুচিন্তিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন ইতিহাসবিদ খাজিম আহমেদ। আবদুর রাউফ স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল 'পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কবিতা ও গান'। সভামুখ্যের দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

২। পরিকল্পনা অনুসারে ৫ ফেব্রুয়ারি, অনুষ্ঠান-মঞ্চে প্রকাশিত হয় 'স্মরণ আবদুর রাউফ' শীর্ষক স্মরণগ্রন্থ। ডিমাই সাইজ, ২৮৫ পৃষ্ঠা সমন্বিত স্মরণগ্রন্থটি বিন্যস্ত হয়েছে আবদুর রাউফ—চোখের আলোয়, আমাদের চোখে, সহকর্মীর উপলব্ধি, পাঠকের প্রতীতি, গবেষকের নির্ণয়, সৃষ্টি-বীক্ষণ, কথালাপে, আমাদের এষণা, সৃষ্টি থেকে চয়ন ও পরিশিষ্ট-১,২,৩ এ।

৩। ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এ সংস্থার ব্যবস্থাপনায় অনলাইনে দুটি সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হয়েছে —

ক) আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ২৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় এক বিতর্ক-সভা। বিতর্কের বিষয় ছিল 'মাতৃভাষা শিক্ষা ও চর্চার সাপেক্ষে ব্যাকরণ গ্রন্থ পাঠ অনাবশ্যক'। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন অমলেন্দু চক্রবর্তী (উপাচার্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম), অরুণকুমার ঘোষ (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়), আমজাদ হোসেন (আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়), মীর রেজাউল করিম (আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়), মুহম্মদ আলমগীর (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ), রশিদুজ্জামান (কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ), সুজিতকুমার পাল (বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়), সঙ্গীতা সান্যাল (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়), সোমা ভদ্র রায় (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়), রমজান আলি, অলিউল্লাহ সরকার সহ আরও অনেক বরেণ্য বক্তিত্ব। সভামুখ্যের ভূমিকায় ছিলেন তপোধীর ভট্টাচার্য (প্রাক্তন উপাচার্য, শিলচর বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম)

খ) ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, 'কথাকারের স্বপ্নের সরণী ধরে ২১-এর ভোর' শীর্ষক বক্তব্য উপস্থাপন করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা সঙ্গীতা সান্যাল।

৪। উজ্জীবন, ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যার বিশেষ বিষয় 'গল্পকার নজরুল'। কাজী নজরুল ইসলামের ছোট গল্প বিষয়ক চারটি বিশেষ নিবন্ধ সংকলিত হয়েছে এখানে। নিয়মিত বিভাগ ঋদ্ধ হয়েছে কবিতা, উপন্যাস, গল্প, রসসাহিত্য, বই-চর্চা প্রভৃতি সহযোগে।

৫। ২৮ জানুয়ারি ২০২৩ 'উজ্জীবন-সন্ধ্যা' শীর্ষক এক সাংস্কৃতিক সভায় অংশ গ্রহণ করেন আলিয়া সংস্কৃতি সহসদ- সদস্য সহ আরও কিছু সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। 'উজ্জীবন' বিষয়ক আলাপ-আলোচনার পাশাপাশি কথাকার ফজলুল হকের এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় এই সভায়। সাক্ষাৎকারটি ইউ টিউবে সংরক্ষিত রয়েছে---লিঙ্ক: https://www.youtube.com/live/15mCOwDwjp0?feature=share

আর্থিক অনুদান

১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৩ সময়সীমায় আলিয়া সংস্কৃতি সংসদকে বিশেষ আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন :

- আব্দুস সামাদ (কল্যাণী সীড ফার্ম, হুগলী) : ২০,০০০/-
- মহিউদ্দিন সরকার (অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক) : ১০,০০০/-
- হাবিবুর রহমান (এক্সপ্রো ল্যাব, কলকাতা) : ১০,০০০/-
- আলিমুজ্জমান (শিক্ষক, বহরমপুর) : ৫,০০০/-
- আফসার আলি (অধ্যক্ষ, শহীদ নুরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়) : ৪,০০০/-
- শেখ কামালউদ্দিন (অধ্যক্ষ, হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়) : ২,০০০/-
- আনোয়ার সাদাত হালদার (সহকারী অধ্যাপক, সাগর দত্ত হসপিটল) : ২,০০০/-

উজ্জীবন-এর স্বজন

- **২৪ পরগনা-উত্তর**
  আমিনুল ইসলাম, বারাসাত, ৯৪৩৩২৩১২০৪
  আসাদ আলি, রাজারহাট ৯১২৩৬৮৯৬১৫
  মশিহুর রহমান, রাজারহাট, ৮০১৭৩৪৩১৫৬
  হাকিমুর রশিদ, হাবড়া, ৯৭৪৮৮৫১১৭৬
- **২৪ পরগনা-দক্ষিণ**
  আব্দুল আজিজ, সংগ্রামপুর, ৮১৪৫৪৪৪১৯৫
  মহিউদ্দিন সরকার, বারুইপুর, ৯৮৩৬৩৮১৪২৫
  মুসা আলি, জয়নগর, ৯১৫৩১৩৫৪৬৮
- **কোচবিহার**
  মাহাফুল আলম, দীনহাটা, ৯৫৬৩৩৭৩১১৪
  সুরাইয়া পারভিন, কোচবিহার সদর, ৮৭৬৮২৭৩৯১২
- **জলপাইগুড়ি**
  আরমান সেলিম, ৯০৯৩৮৮৫৫৪৬
- **দিনাজপুর-উত্তর**
  আসফাক আলম, ৭৯৮০৪৩৪৬২৫
- **দিনাজপুর-দক্ষিণ**
  মীরাজুল ইসলাম, ৮৭৭৭৬৮৯৬৫১
- **নদীয়া**
  সাজাহান আলী, কৃষ্ণনগর, ৯৪৩৪২৪৫২৬২
  সুজিত বিশ্বাস, করিমপুর, ৮৯১৮০৮৯৯৬৩
  হরিদাস পাটোয়ারী, রাণাঘাট, ৬২৯৫৮২৭৬৪৫
- **পুরুলিয়া**
  মহম্মদ খুরশিদ আলম, ৯৯৩২২৬৩৩৭৮
- **বর্ধমান-পশ্চিম**
  আব্দুল মান্নান, আসানসোল, ৯৮৩০২৭৮১২৫
  আমিরুল ইসলাম, দুর্গাপুর, ৯৮৩২৭৪৯২৮৭
  আশরাফুল মণ্ডল, দুর্গাপুর, ৯৪৭৫৯৩৮৩৬৬
- **বর্ধমান-পূর্ব**
  কারিমুল চৌধুরী, বর্ধমান সদর, ৭০০১২৪৪২৮৮
  রমজান আলি, বর্ধমান সদর, ৯৪৩৪০১৪১১৭
- **বাঁকুড়া**
  ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ, ৯৪৭৬২৬৮৫৫৪
- **বীরভূম**
  তৈমুর খান, রামপুরহাট, ৯৩৩২৯৯১২৫০
  ফজলুল হক, সিড়ডি, ৮২৪০৯৭৯০৯৩
  মেহের সেখ, লাভপুর, ৮৫০৯১০২১৫৪
- **মালদা**
  আবদুল মালেক, ৯৫৯৩৭০৬০০৭
  জুলফিকার আলি, চাঁচল, ৯৭৩৪১৯২১৭৫
  মহঃ আদিল, মালদা সদর, ৯৭৩৫৯৩৭৯৫০
  মহঃ ইব্রাহিম, মালদা সদর, ৮৯৭২৫১৯৮৭৯
  শাহ নওয়াজ আলম, কালিয়াচক, ৭০০১২৭৪৯১৫
- **মেদিনীপুর-পশ্চিম**
  কামরুজ্জামান, খড়গপুর, ৯৯৩২২১৫০৩৪
  বিমান পাত্র, ঘাটাল, ৯৪৭৬৩২৯৩১২
  সেখ সাব্বির হোসেন, মেদিনীপুর সদর,
  ৯৬৭৯১৪৮১৭২
- **মেদিনীপুর-পূর্ব**
  আমিনুল ইসলাম, হলদিয়া, ৯০০২৩৭৯৪২৯
  ওয়াহেদ মীর্জা, এগরা, ৯১৬৩৩৮৭৬৬৭
  মোকলেসুর রহমান, কাঁথি, ৭০০৩৫৫৪০০৪
- **মুর্শিদাবাদ**
  আনোয়ারুল হক, বেলডাঙ্গা, ৯৭৩৫৯৪৭৯১১
  আলিমুজ্জমান, বহরমপুর, ৮৬৩৭৫৯৩৭৭২
  মহঃ বদরুদ্দোজা, ডোমকল, ৮০১৬১৬১৭৬৫
- **দার্জিলিং**
  অঙ্কুর মহন্ত, ৯৬৪১২৪২৪১১
- **হাওড়া**
  ইসমাইল দরবেশ, সাঁতরাগাছি, ৭০০৩৪৪৬৬৯৪
  মনিরুল ইসলাম, বাগনান, ৭৯০৮১৮৮০৭১
  সেখ নুরুল হুদা, বাগনান, ৯০৭৩৩১২১৮১
- **হুগলি**
  আনোয়ার সাদাত, ফুরফুরা শরীফ, ৮৯০২৪০৮৪২০
  মুজিবর রহমান, হরিপাল, ৯৬৩৫৭০৬২২০
  সামসুজ জামান, বৈঁচি, ৬২৯০৯৫৬৪৫৪

আমাদের কথা

নতুন ভাবে উদ্যোগ নেওয়ার পরে নব কলেবরে উজ্জীবন-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। লেখার মান, অঙ্গসজ্জা, বর্ণসজ্জা ইত্যাদিতে কমবেশি খামতি থেকে গিয়েছে; যথাসময়ে প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়নি। তবু তারপরও ভালোলাগার রঙে রঞ্জিত আমরা। মার্চ সংখ্যার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হল; পাঠক-প্রতিক্রিয়া ক্রমশ কাঙ্ক্ষিত মাত্রা পাচ্ছে—এসব কিছুর প্রেক্ষিতে এই ভালোলাগা খুব অন্যায় নয় হয়তো।

এ যুগে চিঠি বিরল বস্তু, হোয়াটসঅ্যাপে প্রতিক্রিয়া পাওয়ার প্রত্যাশাও কমিয়ে রাখতে হয়। তবে তারপরেও লিখিত প্রতিক্রয়া পাওয়া গেছে, দূরের জেলা থেকে পাঠকের মেসেজ এসেছে। না, সবটাই প্রশংসামূলক নয়। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মূল্যায়ন; সংশয় ও সমালোচনাও রয়েছে। শুধু সৃজনশীল সাহিত্য এবং তা নিয়ে একাডেমিক আলোচনা নয়; উজ্জীবন-এ সমসাময়িক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়েরও প্রতিবিম্বন থাকুক যথেষ্ট মাত্রায়; এমনটাই পাঠক-প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশার প্রতি সম্মান প্রদর্শন আমরা পরম কর্তব্য বলে জ্ঞান করছি।

প্রশ্ন উঠেছে, উজ্জীবন কি শুধুই মুসলমানদের পত্রিকা? উজ্জীবন-এর অবস্থান প্রসঙ্গে জানুয়ারি সংখ্যা 'আমাদের কথা'-য় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তবু মনে হয় প্রসঙ্গটি নিয়ে আমাদের বক্তব্য আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরা উচিত। মুসলমানদের পত্রিকা বলতে কী বোঝায়? বস্তুত এ প্রশ্নের যথার্থ কোনো উত্তর হয় না। তবু ধরে নেওয়া যেতে পারে —ইসলাম ধর্ম-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে মুসলিম সমাজ বিষয়ক লেখালিখি সম্বলিত কোনো পত্রিকা হল 'মুসলমানদের পত্রিকা'। তাই যদি হয় তবে বলার অপেক্ষা রাখে না 'উজ্জীবন' অবশ্যই তা নয়। এখানে কোনো ধর্মীয় বিষয়াদি প্রধান্য পায় না। তাছাড়া জাতি, ধর্ম, নিরপেক্ষ অনেক লেখাই উজ্জীবন-এ প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

তবে এটা ঘটনা যে, উজ্জীবন মুসলিম সমাজের ভালোমন্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী পরিচালিত এবং একথাও ঠিক যে এই পত্রিকার ফোকাস মুখ্যত শিক্ষিত মুসলিম সমাজের প্রতি। কিন্তু এক্ষেত্রে যা উল্লেখ্য তা হল, মুসলমান সমাজকে ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে এক স্বতন্ত্র পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের লক্ষ্য নয়; আমরা বিশেষ করে চাইছি, এখন মুসলমান সমাজে যে একটা শিক্ষিত অগ্রসর সমাজ তৈরি হয়েছে তাদের মন ও মননে সংস্কৃতিচর্চা ও শিল্পবোধের প্রসার ঘটাতে।

একথা তো অস্বীকার করার নয়, যে এই বঙ্গের মুসলিম সমাজ নানা ভাবেই এখনো পশ্চাৎপদ। এই পশ্চাৎপদতা আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। ধর্মীয় মেরুকরণের অশুভ ছায়া দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। আর্থ-সামাজিক দিক থেকে অনেকটা পিছিয়ে থাকা মুসলমান সমাজের ক্ষেত্রে এর ফল আরও মারাত্মক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা তাই চাইছি, মুসলমান সমাজকে উপলক্ষ্য করে অতিরিক্ত ক্রিয়াশীল হতে। ধর্মীয় সংস্কৃতির চর্চা নয়; বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে মানবিক ও শৈল্পিক চেতনার মূলে আরও বেশি করে বারি সিঞ্চন করা আমাদের স্বপ্ন।

আমাদের সামর্থ্যের সাপেক্ষে আমাদের স্বপ্ন হয়তো আকাশকুসুম; তবু আমরা এই স্বপ্নটিকে ছুঁয়ে থাকতে চাই; একে লালন করতে চাই। আমরা বিশ্বাস করি, বাংলার হাজারও মানুষ, আজও এই দগ্ধ বাস্তবতার প্রেক্ষিতেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এমন স্বপ্নকেই লালন করেন।

পূর্ব ঘোষণা মতো নাটককার নজরুল ও সম্পাদক নজরুল বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি আমরা। মানসম্পন্ন লেখা দেওয়ার পাশাপাশি এ বিষয়ে সম্ভাব্য সকল রকমের সহযোগিতা কামনা করছি সকলের থেকে। মে ২০২৩ প্রকাশিত হবে ঈদ সংখ্যা রূপে। এক্ষেত্রেও অনুরূপ সাহায্য কাম্য। আরও কাম্য প্রিয় পাঠকদের মননশীল প্রতিক্রিয়া।

উজ্জীবন : প্রাপ্তিস্থান
(জেলা)

- অরঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ: বুক কর্ণার, ৯৪৭৫৯৫৩৩৪৫
- করিমপুর, নদীয়া: করিমপুর পুস্তক মহল, ৯৭৩৩৮১১৮১৯
- কৃষ্ণনগর, নদীয়া: বইঘর, ৯৭৩২৫৪১৯৮৪
- চাঁচল, মালদা : পুথিপত্র
- ডোমকল, মুর্শিদাবাদ: রিলেশন (বুকস্টল), ৯৭৩২৬০৯২১০
- দুবরাজপুর, বীরভূম : টিচার্স কর্নার
- বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান : রমজান অ্যাকাডেমী, ৮৭৭৭৩৯৬৬৩২
  বিবেকানন্দ বুক অ্যান্ড জেরক্স সেন্টার, ৯৩৭৮১৩২৬৮৭
- বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা : সাহা বুক স্টল, ৯৮৩২৮০৬৬৬৩
- বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ : বিশ্বাস বুক স্টল, ৯৮০০০০০০৪৯
  আদর্শ বুক সেন্টার, ৯৪৩৪৩৯৪৪৫২
- বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা : মল্লিক গ্রাফিক্স, ৯১৬৩৪৮৬৭৬৬
- বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : অন্নপূর্ণা বুক হাউস, ৯৭৮৩৭৪৪৪৯৮
- বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর : কৃষ্ণ বুক হাউস, ৯৪৩৪৩৯৪২১২
- মালদা সদর, মালদা: আদর্শ পুস্তকালয়, ৯৫৯৩৭০৬০০৭
- মালদা সদর, মালদা: পুনশ্চ, ৯১২৬৫২৩৭৫৪
- মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর : মল্লিক পুস্তক বিপণি, ৯৯৩২০৫৭৬৬৭
- শিলিগুড়ি, দার্জিলিং: ইকনমিক বুক স্টল
- সংগ্রামপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : ছাত্র সাথী, ৯৫৯৩৪৮২১৬৯
- সিউড়ি, বীরভূম : ভারত পুস্তকালয়

পূর্ব প্রকাশিত আলিয়া ও উজ্জীবন

ত্রৈমাসিক আলিয়া
জানুয়ারি ২০১৫
এপ্রিল ২০১৮ (বিশেষ বীক্ষণ—সোহারাব হোসেন)
জুলাই ২০১৮ (বিশেষ বীক্ষণ—আফসার আমেদ)
অক্টোবর ২০১৮ (বিশেষ বীক্ষণ—আমার চোখে ঈদ)
মার্চ ২০১৯ (বিশেষ বীক্ষণ—আব্দুর রাকিব)
জুন ২০১৯ (বিশেষ বীক্ষণ—ওয়ালে মুহম্মদ)

মাসিক আলিয়া
মার্চ ২০২০, আগস্ট ২০২০, সেপ্টেম্বর ২০২০, অক্টোবর ২০২০
(কোভিদ ১৯ এর প্রেক্ষিতে পত্রিকা প্রকাশ ব্যাহত হয়। মার্চ ২০২০ মুদ্রিত হয়েছিল। অন্যগুলি ছিল সফট কপি)

পাক্ষিক আলিয়া
জুন, জুলাই, আগস্ট ও অক্টোবর মাসে যথাক্রমে দুটি করে সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সেপ্টেম্বরে কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি।
(পাক্ষিক আলিয়া ছিল ৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত, ৮টি করে নিবন্ধের সংকলিত রূপ। এর কোনোটি মুদ্রিত হয়নি। সবই ছিল সফট কপি।)

মাসিক উজ্জীবন
মে ২০২১, জুন ২০২১, সেপ্টেম্বর ২০২১, জানুয়ারি ২০২২, ফেব্রুয়ারি ২০২২, মার্চ ২০২২, এপ্রিল ২০২২, মে-জুন ২০২২।

* নানা কারণে আলিয়া ও উজ্জীবন এর পথচলা ব্যাহত হয়েছে।
** আলিয়া বা উজ্জীবন এর সমস্ত সফট কপি বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। যোগাযোগ : ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯

সংখ্যাসূচি

পাঠক-দর্পণ : আজিজুল হক

পবিত্র উচ্চারণ : আপনার মুখটি দেখতে ...—বিশ্বজিত রায় ১১

ফিরে দেখা : তীর্থঙ্কর দিলীপকুমার—পূর্ণা মুখোপাধ্যায়১৪

নজরুল-চর্চা : নজরুল জীবনী : তুলনামূলক আলোচনা—শেখ কামাল উদ্দীন ১২

ধারাবাহিক উপন্যাস : ঘূর্ণাবর্ত—সেখ রফিকুল ইসলাম ৩২

গল্প : নষ্ট আর্তনাদ—ফজলুল হক ৩৭
ধোঁয়াশা—আমিনুর রাজ্জাক দফাদার ৪২

এষণা : এক দেশহারানো মানুষের সন্ধানে—হাসিবুর রহমান ৪৫

দৃষ্টিপাত : বিলকিস বানো এবং কিছু প্রশ্ন— শফিকুল হক ৫০

উদ্যোগ: বঙ্গীয় সাহিত্যিক অনুসন্ধান সমিতির কথা—এম রুহুল আমিন ৫৪

ভ্রমণ: হৃদয়ের গহনে ছুঁয়ে যাওয়া সেই চুম্বন—মহম্মদ বাকীবিল্লাহ মণ্ডল ৫৬

বঙ্গ-দর্পণ : বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে—আব্দুল বারী ৬২

বইচর্চা : সাইফুল্লা, জাহির আব্বাস, মামুদ হোসেন, এটিএম সাহাদাতুল্লা, আয়েষা খাতুন, ৬৯-৭২

নিবেদন

১। বার্ষিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা দিয়ে মাসিক 'উজ্জীবন' এর গ্রাহক হন। এ বিষয়ে আপনার নিকটবর্তী প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

২। আলিয়া সংস্কৃতি সংসদের যাবতীয় প্রকাশনা কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত থাকার জন্য বার্ষিক ১০০০/- (এক হাজার) টাকার বিনিময়ে সার্বিক প্রকাশনা গ্রাহক হওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। এই অর্থ এমনিতে অনুদানমূলক সহায়তা হিসেবে বিবেচিত হবে; পাশাপাশি এর সাপেক্ষে সংসদ প্রকাশিত 'উজ্জীবন' সহ যাবতীয় পুস্তক উপহার হিসেবে প্রদান করা হবে; যার অর্থমূল্য হবে এক হাজার বা ততোধিক টাকা।

৩। আমাদের এই পথচলায় আপনাকে সহযাত্রী ও সহকর্মী হিসাবে পেতে চাই । অনুরোধ থাকছে, সাধারণ অনুদানের পাশাপাশি বৃহত্তর লক্ষ্য রূপায়ণের লক্ষ্যে, বিশেষত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের সাপেক্ষে আপনার দেয় যাকাতের অংশবিশেষ প্রদান করুন।

লেনদেন

A/C 31590592615

1FSC SBIN0001299
PHONEPE 7872422313
(AZIZUL HOQUE)
GPAY 9734662118
(MAMUD HOSSAIN)

হোয়াটস্‌অ্যাপে (৮৬৩৭০৮৬৪৬৯) স্ক্রিন শট পাঠান
যোগাযোগ : ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯, ৯৪৩২৮৮০২৪২
aliahsanskriti@gmail.com

বাঙালি মুসলমান লেখিকা ৭৫০
চিত্ররেখা গুপ্ত
সাহিত্য সংসদ
(অনন্য গবেষণা গ্রন্থ। সামাজিক মূল্যের সাপেক্ষেও অবিস্মরণীয়।)

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ প্রকাশনা
সোহরাওয়ার্দী পরিবার ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার—আলিমুজ্জমান
নেপথ্য-নায়ক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন—খন্দকার মাহমুদুল হাসান (জীবনীমালা-১)
মৌলবি মুজিবর রহমান ও 'দ্য মুসলমান'—মিলন দত্ত (জীবনীমালা-২)
ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী ও বাংলার নবজাগরণ—সামশুল আলম (জীবনীমালা-৩)
নূরন্নেছা খাতুন রচনা সমগ্র—মীর রেজাউল করিম (প্রকাশিতব্য)
চরিতাভিধান বাংলার মুসলমান সমাজ—সম্পাদকমণ্ডলী (প্রকাশিতব্য)

প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে
বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সাহিত্যচর্চা
সম্পাদনা : সাইফুল্লা ও কামরুল হাসান
১-৪ খণ্ড, ২৫০০/-
বুকস স্পেস
হাতিয়াড়া, পূর্বপাড়া ● কলকাতা-১৫৭
● যোগাযোগ : ৯১৪৩১৩৪৯৯৩

মাননীয় সম্পাদক
উজ্জীবন

'উজ্জীবন' ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এর পাঠ নিয়ে পরিতৃপ্ত হওয়া গেল। এখানে রয়েছে গল্পকার নজরুল বিষয়ক চারটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ। বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব হয়েছিল গল্পকার রূপে। অতঃপর ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু গল্প লিখেছিলেন তিনি। গল্পগুলি অবশ্যই গুণে মানে নিতান্ত সামান্য ছিল না। এদিকে সেসবের চর্চা এখন নেই বললেই চলে। গল্পকার নজরুল মোটের উপর অনালোচিত ও উপেক্ষিত বিষয়। এমন অনাকাঙ্ক্ষিত বাস্তবের প্রেক্ষিতে গল্পকার নজরুল বিষয়ক এই আয়োজন তাৎপর্যপূর্ণ।

অধ্যাপক লায়েক আলি খান তাঁর 'নজরুল ইসলামের ছোট গল্প' শিরোনামাঙ্কিত রচনায় নজরুলের গল্পের প্রকাশ, প্রকাশকাল সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন এবং গল্প-আখ্যান ও এর শৈল্পিক পরিচয় পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছেন। তিনি ব্যথার দানের চরিত্রগুলিকে ব্যাখ্যা করে আঙ্গিকের দিক থেকে একে রজনী বা ঘরে-বাইরে-র উত্তরসূরি বলে মনে করেছেন; কোনো কোনো গল্পে অনুভব করেছেন গীতিকবিতার স্পন্দন। রোমান্টিক প্রেম-কথাকে তৎকালীন জীবনতৃষ্ণা ও বলিষ্ঠতা দিয়ে বাংলা গল্পে একমাত্র নজরুলই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন বলে মনে করেছেন তিনি। মহম্মদ ইব্রাহিম 'গল্পকার নজরুল ইসলাম' শীর্ষক রচনায় নজরুলের রাক্ষুসী, স্বামীহারা, পদ্ম-গোখরো, জিনের বাদশা, অগ্নিগিরি এই পাঁচটি গল্পের মনোজ্ঞ বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর আলোচনা সূত্রে কবি নজরুলের মতো গল্পকার নজরুলও যে সর্বহারা মানুষের দুঃখময় জীবনের যন্ত্রণায় কাতর, বিদ্রোহী-প্রতিবাদী, সর্বোপরি দেশপ্রেম বা স্বদেশচেতনায় তপ্ত তা প্রতিপন্ন হয়েছে। অধ্যাপক সাইফুল্লা-র 'প্রসঙ্গ : নজরুলের শিউলি মালা' তাৎপর্যপূর্ণ রচনা। শিউলি মালা-য় সংকলিত চারটি গল্পের বিষয়, ভাব ও রচনারীতি সংশ্লিষ্ট অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণ রয়েছে এখানে। 'নজরুলের গল্প : সমাজ-সংস্কৃতি' শিরোনামাঙ্কিত নিবন্ধে লেখক মিরাজুল ইসলামের সিদ্ধান্ত এইরকম—'তাঁর সব গল্পকে ছোটগল্পের আঙ্গিকে ফেলে বিচার করলে নজরুলের ব্যর্থতা প্রকট হয়ে ধরা পড়বে। কিন্তু গল্প হিসাবে পড়তে গেলে রস আস্বাদনে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।'

কবিতা অংশে সংকলিত সা'আদুল ইসলাম 'চিকেন চরু' অনার্য ভারত, আর্য ভারতের দ্বান্দ্বিক সমীকরণের অসামান্য কাব্য রূপায়ণ? কবিতাটি এর রূপে ও রসে কাব্যসত্যের অতিরিক্ত আরও কোনো সত্যের ব্যঞ্জনা বহন করে। ফাহিম হাসান এর 'যে কবিতা প্রকাশযোগ্য নয়' আলাদা করে ভাবায়, অনুপ্রেরণা দেয়, বেঁচে থাকার শক্তি জোগায়। কবি একাদশ শ্রেণিতে পাঠরত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই যদি হয় তবে ফাহিম হোসেনের কবিতার পথ দীর্ঘ ও সুমসৃণ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

মুদ্রিত দুটি গল্পই চিত্তাকর্ষক। মুসা আলির 'রাতের সঙ্গী'-তে বেশ একটু অতিপ্রকৃতিক অণুরণন আছে; যা গাল্পিক বাস্তবতাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। কামাল হোসেনের 'নিজস্ব পুরণে' যৌনপল্লির হতভাগিনী মেয়েদের জীবনে নতুন সূর্যোদয়ের সম্ভাবনায় দীপ্ত। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির নিজস্বতা এখানে পাঠকের জন্য পরমআশ্রয়।

সাম্প্রদায়িকতার দহনে দগ্ধ আজকের সামাজিক বাস্তবতার সাপেক্ষে 'বেঁধে বেঁধে থাকার সেই সব দিন' আমাদের চেতন মনের অঙ্গনে বেশ একমুঠো আলো ছড়িয়ে দেয়। সত্তরের দশকে বাংলার গ্রাম জীবনে হিন্দু-মুসলমানের নিবিড় সহাবস্থানের বর্ণময় উপস্থাপন রয়েছে এখানে। রয়েছে উত্তরকালের রক্তাক্ত বাস্তবতার ছায়াপাতও। বইচর্চা পর্বে মইনুল হাসানের 'বাঙালি ও বাঙালি মুসলমান' গ্রন্থের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন ইনাস উদ্দিন।

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদের মুখপত্র 'উজ্জীবন' সংস্কৃতি-মনস্ক মননমাত্রকে উজ্জীবিত করবে বলে আশা করা যেতে পারে। তবে তার জন্য সম্পাদকমণ্ডলীর আরও সক্রিয়তা বাঞ্ছনীয়। গল্পকার নজরুল বিষয়ক চারটি রচনা গতানুগতিক; বৈচিত্র্যের অভাব আছে এখানে। সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক রচনার পাশাপাশি আমাদের প্রত্যক্ষ সামাজিক সমস্যা-সংকটও উজ্জীবন-এর দর্পণে প্রতিবিম্বিত হওয়া দরকার। বানান বিষয়ে বেশ কিছু অসংগতি চোখে পড়েছে; আশা করা যায় সম্পাদকমণ্ডলী এ দিকেও বিশেষ নজর দেবেন।

আজিজুল হক। অরঙ্গাবাদ। মুর্শিদাবাদ

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ প্রকাশনা

আবদুর রাউফ : চোখের আলোয়
আসাদ রাউফ
মুসতাবসেরা রাউফ
আবদুর রাউফ : আমাদের চোখে
খাজিম আহমেদ
আহমদ হাসান ইমরান
মইনুল হাসান
শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়
উৎপল ঝা
অনল আবেদিন
মুহাম্মদ হেলালউদ্দিন
সিরাজুল ইসলাম
সা'আদুল ইসলাম
মুজিবর রহমান
গোলাম রাশিদ
ইমানুল হক
গোলাম গউস সিদ্দিকি
আবদুর রাউফ : সহকর্মীর উপলব্ধি
মেঘ মুখোপাধ্যায়
শহীদুল ইসলাম
বর্ণালী ঘোষ দস্তিদার
জাইদুল হক
অভিজিৎ কর গুপ্ত
আবদুর রাউফ : পাঠকের প্রতীতি
জাহিরুল হাসান
আমিনুল ইসলাম
আসাদুল ইসলাম
আবদুর রাউফ : গবেষকের নির্ণয়
কস্তুরী মুখোপাধ্যায়

আবদুর রাউফ : সৃষ্টি-বীক্ষণ
স্বাধীনতা উত্তর পর্বে পশ্চিম বাংলার মুসলমান—রমজান আলি
মুক্তমনের সংকট—শেখ নজরুল ইসলাম
গণতন্ত্র ও সংখ্যালঘু সমস্যা—সেখ জাহির আব্বাস
ভারতের বাংলাভাষী মুসলমান—ইনাস উদ্দীন
বহুমাত্রিক নজরুল—আবু রাইহান
আবদুর রাউফ : কথালাপে
আবদুর রাউফ : আমাদের এষণা
আমজাদ হোসেন
মুহম্মদ হাবিব
লেখক-কথক পরিচিতি
পরিশিষ্ট-১
আবদুর রাউফ : সৃষ্টি থেকে চয়ন
পরিশিষ্ট-২
জীবনপঞ্জি
লেখালিখির রূপরেখা
প্রাপ্ত পুরস্কার ও সম্মাননা
পরিশিষ্ট-৩
অসুস্থতার সংবাদ
মৃত্যু সংবাদ
স্মরণসভা
স্মরণসভা বিষয়ক প্রতিবেদন
পরিশিষ্ট-৪
ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও অন্যান্য ছবি
শংসাপত্র, মানপত্র প্রভৃতির প্রতিলিপি
বই এর প্রচ্ছদ
স্মরণসভার কার্ড

ঘোষণা : আমরা ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এ, আলিয়া সংস্কৃতি সংসদের পক্ষ থেকে 'আবদুর রাউফ রচনাবলি' প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেছি। এই প্রেক্ষিতে আপনার ঐকান্তিক সহায়তা কামনা করি। আবদুর রাউফ প্রণীত অগ্রন্থিত রচনার সন্ধান দিয়ে অনুগ্রহ করুন। যোগাযোগ : ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯

আপনার মুখটি দেখতে আমার বড় ইচ্ছে করে, হে মহম্মদ!

বিশ্বজিৎ রায়

(নবী মুহম্মদ (স.) কে ঘিরে প্রিয়কথার পাশাপাশি অপ্রিয় কথাও নিতান্ত কম বলা হয়নি। সেসব প্রিয় বা অপ্রিয় কথার ভিড়ে হারিয়ে যায় না এই উচ্চারণ। এর অনন্যতা অনস্বীকার্য।)

১

গুহামানবের কাল থেকে মানুষ নিজেকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসে।

নগরে - পাথরে, মিনারে - মুদ্রায় নিজেকে অক্ষয়- অমর রেখে যেতে কত না দাস, শিল্পীর ঘাম- রক্ত- কান্না ঝরিয়েছে অগণিত রাজা- রাণী, সম্রাট- সম্রাজ্ঞীর দল।

এমনটা নয় যে আপনি মরুভূমির চোরাবালিতে নিজেকে মুছে দিতে চেয়েছিলেন।

আল্লাহর বান্দাগিরির সঙ্গে দুনিয়াদারিতেও আপনার নজর ছিল বেশ।

আপনার ভক্তদের চোখে আপনি সুপুরুষ, রমণীমোহন এক স্বল্পবিত্ত কোরেশ, যিনি আল্লাহকে ভয় পেতেন, কিন্তু শত্রুদের নয়।

তবু, আপনি আত্মপ্রতিকৃতি সাজিয়ে রাখার লোভ জয় করলেন —

পাছে, আপনার উম্মত আল্লাহর একরাট ও অসীম রূপ ভুলে সেজদা করে আপনাকে।

২

প্রতিবেশী বাইজানটাইন আর পারস্য সাম্রাজ্য জুড়ে ইহুদি, খ্রীষ্ট থেকে জরথুস্ট, নানা মতে তখন একেশ্বরের উপাসনা।

তার মধ্যেই একরঙা মরুভূমির দেশে আপনি দেখতে পেলেন লা-শরীক আল্লাহের ফরিস্তাকে, ইসলামের মন্ত্রে জুড়লেন বিভক্ত আরব সমাজকে।

আমি অসীমে - সসীমে, রূপে - অরূপে মেলানো জলজংলা দেশের মানুষ,

নিরক্ষর আপনার শুরুর আত্মসংশয় আর পরের একবগগামির সবটা বুঝতে পারি না।

৩

কিন্তু সেলফি যুগের আমি বুঝতে পারি,

আত্মমুগ্ধতা ভুলতে কলজের জোর লাগে। নয়নসমুখে উপাস্য বিগ্রহ না বনেও অযুত হৃদয়ের স্পন্দনে বেঁচে থাকার আত্মবিশ্বাস,

শেষ বিচারে নিজেকে শুধুই একজন মানুষ ভাবতে পারার সাহস — ইতিহাসের খুব কম নায়কেরই ছিল।

৪

মোজেস-যীশু, রাম-কৃষ্ণ, বুদ্ধ- মহাবীর এ ব্যাপারে কি নির্দেশ দিয়েছিলেন, জানি না। তাদের আদি আদল কবেই মিশে গিয়েছে সময়ের প্রত্নশরীরে।

তারপর মূর্তিপূজারী হোক বা না হোক, ভক্তরা, এমনকি কবিরাও নিজেদের কল্পনার রঙে নবী -অবতারদের মুখটি এঁকেছেন, বদলেছেন কালে কালে।

তাই অলিভছায়ামাখা পাথুরে দেশের ছুতোর সন্তানটি কালে কালে হয়ে দাঁড়ালেন অনিন্দ্যসুন্দর, নীল চোখ সাদা অমৃতের পুত্র। মোজেস মানেও হলিউডের চার্লটিন হেস্টন। ঘন দাড়ি নিয়ে পরমপিতাও শ্বেতকায় বৃদ্ধ সিস্টিন চ্যাপেলে।

তাই ঈশ্বরের আদলে মানুষ না বিজয়ী মানুষের আদলে ঈশ্বর, তর্কটা থেকেই গিয়েছে।

আর এই কালো- তামাটে দেশে দিব্যকান্তি রাম-কৃষ্ণ-শিবকে চোবানো হল নীলের গামলায়। তরাইয়ের বুদ্ধও সাদা, মাথায় কোঁকড়া চুল। চাষীবাসী নানকের গায়েও উজ্জ্বল গমরঙ।

দেবাংশী পুরুষেরা আজও বেঁটে, কুচ্ছিত গড়পড়তা ভক্তেরদের মতো দেখতে নন।

কারণটা বুঝতে পারি; কেননা আমার খর্বুটে বাবা উত্তম কুমার হতে চেয়েছিলেন, ক্ষয়াটে আমি অমিতাভ।

৫

আত্মমোহ আর সংশয়, অন্দরের আলো আর কালো নিয়েই তো এতোকাল মানুষ রংবাহার !

এই রক্তমাংসের শরীর বড় বালাই, মাটির সংসারের মায়া মরেও মরে না।

তাই কাঁটার মুকুট মাথায় ক্রুশবিদ্ধ যিশুর যন্ত্রণায় জীবনের যত দ্বিধা আর আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে যায়, শিকড়ের মতো টানে।

কিন্তু ভক্তরাই তাঁকে অপাপবিদ্ধ ভগবান, আর আপনাকে শয়তান বানালো সেই ক্রুসেডের কাল থেকে।

আপনি নবী -পরম্পরায় মরিয়মপুত্রকে পূর্বসূরী মেনেও তাঁকে ঈশ্বরপুত্র মানেননি। শুধু কি এই রাগে?

নাকি, এর সাথে জুড়ে ছিল জেরুজালেমের অধিকার, দুনিয়া জুড়ে সাম্রাজ্যের দীর্ঘ যুদ্ধে প্রতিশোধস্পৃহা?

৬

আপনি বিশ্বপতির সঙ্গে ভক্তজনতার সেতু, আবার মাটিতে সার্বভৌম যোদ্ধা-শাসক। আইন আপনার তৈরি, আপনিই বিচারক।

এমন একচ্ছত্র ক্ষমতা একনায়কতন্ত্রের জন্ম দেয়, যা আমি মানতে পারি না।

কিন্ত কয়েক হাজার বছর আগে মোজেসও তো তাই ছিলেন। যীশুও তো হতে চেয়েছিলেন ইহুদিদের নতুন রাজা, ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণের বকলমে।

ডেভিড থেকে রামেসিস, নিরো থেকে দারিয়ুস তো বটেই, তার পরেও তো আকাশ এবং মাটির সিংহাসনের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগের দাবি অবিরাম।

অশোক- আকবর- ঔরঙ্গজেবের কাল পেরিয়ে এখন রামরাজ্য নির্মাণই ভারত সম্রাটের পুঁজি।

আজ গণতন্ত্র আর ধর্মযুদ্ধকে মেলাতে কুরুক্ষেত্রের পথে নেমেছেন তিনিও। তবে আপনার মতো তার গুহাধ্যান থেকে বিজয় হুংকার, শুধু স্মৃতি ও শ্রুতির ভরসায় পড়ে নেই।

৭

ওরা বলল: তৌহিদ নয়, তলোয়ারের জোরেই আপনার সাফল্য।

বর্ণ-জাতি ভেদাভেদ ভোলার ডাক আপনার ভেকমাত্র।

কিন্তু কুরআনের আগে তোরা - বেদ- বাইবেলেও নানা জাতি ও জ্ঞাতিযুদ্ধের বর্ণনা।

আদিকাল থেকে আর কোনও মহামারী মানুষকে এতটা মারেনি।

নিজেদের সীমানা পেরিয়ে সাম্রাজ্যলিপ্সার পায়ে পায়ে, ধ্বংস আর মৃত্যুর বিভীষিকা এসেছে বারবার। এর মধ্যে আপনার অনুসারীরাও ছিলেন।

তবে চেঙ্গিস খানের পরে এসেও তাকে পেরিয়ে গিয়েছে যারা, তারাই আজ সভ্যতা ও শান্তির একক প্রহরী!

যুদ্ধে তো গিয়েছিলেন আমাদের দুই অবতার রাম এবং কৃষ্ণও;

ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠিতে স্বজনহত্যার মাহাত্ম্য ঘিরে ধর্মকথা রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও পুরাণে।

ক্ষত্রিয় পুরুষের অভাবে অন্তঃপুরেও বিশৃঙ্খলা বেড়ে বর্ণসঙ্করে ভরে যাবে রাজ কুল, এই দুশ্চিন্তাও প্রবল ছিল।

আবার শান্তি- সহাবস্থান, অনুশাসন কথাও সকল পবিত্র কিতাবে।

আসলে মানুষের ইতিহাসে ভালো-মন্দ যা কিছু ঘটেছে, তারই জলছবি ফুটে উঠেছে ঈশ্বরের আঙ্গুলের ছায়ায় পৌরুষেয় তুলিতে।

৮

প্রাচীনতর ধর্মগুলির মতোই আপনি একেশ্বরে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীদের ভাগ করেছেন।

যিহোবার মতো আল্লাহ কখনো শুধু আপনার উম্মতের রাখোওয়ালা, কখনো তিনি গোটা মানবজাতির পিতা।

কেউ বলবে, আপনার রাজনীতি-কূটনীতির মতো ধর্মনীতিও এক পা আগে দু পা পিছে চলেছে। কেউ আবার বলবে, আপনার ঈশ্বরভাবনায় আবহমান মানুষের টানাপোড়েন—

মাটির সংকীর্ণতা না আকাশের উদারতা, কী ভাবে মেলাবো আমি - তুমি আর তাঁকে!

কিন্তু আপনার সময় থেকে অনেক দূরে আজও আমরা-ওরার বিভাজনে মত্ত আমাদের চতুর শাসকেরাও।

অন্ধ প্রতাপের সামনে নতজানু জনতা, ভেড়ার পালের মতো অনুগামী আজও। কোন লজ্জায় তবে সেকালকে দায়ী করি!

৯

বহুকাল ধরে আপনার বিরুদ্ধে কুৎসার হাতিয়ার: ঘরে বাইরে নারীর প্রতি আপনার মনোভাব, আপনার যৌন জীবন।

অবাধ্য স্ত্রী- দাসীদের বশে আনতে আপনার নিদানগুলি মোটেই আজ পাতে দেওয়ার যোগ্য নয়।

কিন্তু নতুন ও পুরনো বাইবেলে, বেদ- আবেস্তা গীতায়ও কি ছিল অর্ধেক আকাশের স্বীকৃতি?

নারীর শরীরে তার সম্পূর্ণ অধিকার কি আজো স্বীকৃত আলোকিত মহাদেশে?

আপনার সময়ের আরবে কন্যাহত্যা বন্ধ ও বহুবিবাহকে সীমিত করে পিতার সম্পদে মেয়ের অধিকার মেনেছিলেন অনেক দূর। বিধবাদের সংসার- অরণ্যের গহন কোণে, নির্বাসনে পাঠাননি।

তবে নারীর যৌনতার অধিকার নয়, পূর্বগামীদের মতো আপনারও মাথাব্যথা ছিল, অনুগামী পুরুষদের খেলার নিয়ম বাঁধায়।

আপনি নিজেকে কামনারহিত বিবাগী পুরুষ হিসেবে দেখেন নি।

প্রব্রজ্যা থেকে অন্তিমশয্যায় প্রিয়া ম্যাগদালেনের প্রতি যীশুর প্রেমকে স্বীকার করেনি যারা, নারীকে বানিয়েছে নরকের দ্বার, আজও যাজকের লিঙ্গলিপ্সাকে ঢাকতে যারা গলদঘর্ম, তারাই আপনাকে ভণ্ডামীর দায়ে কাঠগড়ায় তোলে।

অথচ, রমণপ্রতিভায় আপনি বাবা আব্রাহাম বা আমাদের শ্রীকৃষ্ণের ধারেকাছে ছিলেন না!

১০

যৌবন জুড়ে আপনার আনুগত্য প্রৌঢ়া স্ত্রীর প্রতি। তার মৃত্যুর পর শেষ বয়সে আপনার বালিকা বধূকে নিয়েই কেচ্ছা সবচেয়ে বেশি।

যুগে যুগে আয়ুর মাপ মতো যৌবনঋতুর শুরু ও শেষ সীমা বদলেছে বারবার।

যে সমাজে বালিকাবধূর রক্তে ভিজেছে বহু মহাপুরুষের বিছানা এই সেদিনও, সেখানেও আজও চাঁদমারি আপনাকে ঘিরে।

আর সেই বালিকাবধূ ছিলেন আপনার প্রিয়তমা, বয়সের ধর্ম মেনেই স্নেহ- প্রেমে ও প্রশ্রয়ে যার প্রতি আপনি ছিলেন অকাতর।

আর দশটা সতীন-বিবাদে কণ্টকিত সংসারের মতোই

মাঝেমধ্যেই আপনি ডেকেছেন আল্লাহকে, ঘরের শান্তি রক্ষায়।

ওই মুখরা, স্বাধীনচেতা মেয়েটির কোলে মাথা রেখে আপনার যাত্রা শেষ, ইসলামে নবী ও নারীচেতনাকে মেলানোর শুরু।

১১

সন্দেহ নেই, মোজেস - যীশুর মতোই আপনার উম্মতেও আদি সত্যের স্বত্ব নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে খুনোখুনি অনেককাল। আজও জিহাদি আর কাঠমোল্লার দল মুছে দিতে চায় ভিন্নমতের অধিকার, তাদেরই মৌরসিপাট্টা আল্লাহ ও নবীর নিয়মে।

আসলে ঈশ্বরপ্রেম নয়, তাবত বখেড়ার শুরু ও শেষ রাজসিংহাসনে।

কিন্তু অবিরাম রক্তপাত আজ তো রাম-কৃষ্ণ এমনকি বুদ্ধের নামে।

অথচ আমাদের কানফাটা বুলডোজার বাবাটিও মনে মনে জানে,

বৌদ্ধ সিদ্ধাই আর সুফিরা মিশে আছে তার ও আমার হিন্দু পরিচয়ে।

সেকেন্দার- মিহিরকুল- কনিষ্ক, কেরলপুত্ত- চোল -চালুক্যের সাথে বিরসা- সিদো মিলে গেছে তিন সাগরসঙ্গমে।

১২

তবু আপনি ক্রমশ একাই শয়তান, অবিমিশ্র মন্দের প্রতীক। ইতিহাস ঘিরে এই ভয়ঙ্কর মিথ্যাচারে, আকীর্ণ ঘৃণা ও হিংসার অন্ধকারে, আপনার অপমানিত মুখটি দেখতে বড় ইচ্ছে করে।

[ফেসবুক থেকে সংগৃহীত]

বুকস স্পেস

হাতিয়াড়া, পূর্বপাড়া - ৭০০ ১৫৭

দূরভাষ : ৯১৪৩১৩৪৯৯৩ ● e-mail : booksspace2011@gmail.com

সংকলন ও সম্পাদনা : স্বপন বসু

সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ ১০০০/

জহর সেনমজুমদার

হৃল্লেখবীজ ২০০/ **আমার কবিতা** ৩০০/

ভাঙা বাংলা; ভাঙা হ্যারিকেন ১৫০/

ভবচক্র; ভাঙা সন্ধ্যাকালে ১৫০/

সোহারাব হোসেন

বাংলা ছোটগল্পে বাস্তবতাবোধের বিবর্তন ২৭৫/

আসিফ জামাল লস্কর

মুসলিম স্পেনের ইতিহাস ২০০/

দীপঙ্কর বিশ্বাস

সাময়িকপত্রে ঔপনিবেশিক বাংলার অর্থনৈতিক চিত্র ৩০০/

বিমলানন্দ শাসমল

স্বামী বিবেকানন্দ ও ইসলাম ধর্ম ১৫০/

সংকলক ও সম্পাদনা : রেজওয়ানুল ইসলাম

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য ৫০০/

ড. আব্দুল খায়ের সেখ

'মুসলমানী' পুঁথি সাহিত্য ৪০০/

অমৃতা ঘোষাল

অর্বাচীনের চোখে সুকুমার সেন ৩৫০/

বাংলা সাহিত্যে রসনাবিলাস ৩০০/

সংকলন ও সম্পাদনা : সাইফুল্লা, এ টি এম সাহাদাতুল্লা

দিগ্‌দর্শন ২৫০/ **সমাচার দর্পণ** ২৫০/

সম্পাদনা : কাজী মাসুদা খাতুন, রবিউল আলম

একুশ শতকের বাংলা উপন্যাস : অন্বেষণ বীক্ষণ ৪০০/

তীর্থঙ্কর দিলীপকুমার

পূর্ণা মুখোপাধ্যায়

(দিলীপকুমার রায় সংগীতজ্ঞ। তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্যুতি ও গভীর মননশীলতা নজর কেড়েছিল সমকালের দেশ-বিদেশের বিদগ্ধ জনদের। তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন তাঁরা। একশো পঁচিশতম জন্মবর্ষে নিবেদিত সেই সম্পৃক্ততার ইতিবৃত্ত বিষয়ক নিবন্ধ)

এককালে তাঁর সঙ্গীত ও কণ্ঠলাবণ্যে মুগ্ধ ছিলেন দেশ-বিদেশের বহু মানুষজন। রোম্যাঁ রোলাঁ থেকে মহাত্মা গান্ধি, শরৎচন্দ্র থেকে সাধারণ বাঙালি শ্রোতা তাঁর গান শুনে পরম তৃপ্ত হয়েছেন। পিতৃবন্ধু রবীন্দ্রনাথের তিনি স্নেহভাজন, ঋষি অরবিন্দের প্রিয় শিষ্য, সুভাষচন্দ্র বসুর সতীর্থ ও সহমর্মী বন্ধু। প্রখ্যাত নাট্যকার এবং সঙ্গীত রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের তিনি একমাত্র পুত্র ও আদরের সন্তান দিলীপকুমার রায়। এত নক্ষত্রের আলো যাঁর জীবনকে ঘিরে, তিনি নিজেও যে স্বমহিমায় দীপ্যমানএক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তা অনুমান করা কঠিন নয়। এবং দিলীপকুমারের প্রতিভার বিকিরণ কেবল সঙ্গীতে সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যে ছিলেন সমান সুপণ্ডিত, বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র, অধ্যাত্মপথের বিশিষ্ট সাধক। লিখেছেন অজস্র গদ্যরচনা ও কবিতা। সেসব লেখায় দিলীপকুমারের রসবোধ ও মননশীলতার চিহ্ন সুস্পষ্ট। যদিও তাঁর সঙ্গীতের তুলনায় সাহিত্যরচনা অনেক কম জনপ্রিয়। এত কৃতিত্ব সত্ত্বেও শিক্ষিত বাঙালি তাঁকে তেমন মনে রাখেননি। হয়তো মধ্যবয়সে সন্ন্যাস নিয়ে সংসার থেকে দূরে চলে যাওয়াই তার কারণ। তবে কারণ যাই হোক, এই বিস্মৃতি তাঁর প্রাপ্য ছিল না। তাই এ বছর দিলীপকুমার রায়ের একশো পঁচিশতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর জীবন ও সাধনার দিকে একবার ফিরে দেখা যেতে পারে।

শৈশবে মাতৃহীন দিলীপকুমার বড়ো হয়েছিলেন পিতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অগাধ স্নেহে ও প্রশ্রয়ে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল ও তাঁর বন্ধুদের সাহিত্য-আলোচনা ও সংস্কৃতি-চর্চার আবহ এবং নিবিষ্ট অধ্যয়নের স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত দিনগুলি হারিয়ে ফেললেন মাত্র ষোলো বছর বয়সে, পিতার অকালমৃত্যুতে। ততদিনে অবশ্য বেশ পরিণত হয়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্যরুচি এবং সঙ্গীতে অনুরাগ। গভীর হয়েছে ধর্মসাধনার প্রতি মেধাবী দিলীপের আকর্ষণ। বড়োদের সঙ্গে তাঁর আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কে দেখা যাচ্ছে অসাধারণত্বের প্রকাশ। হয়তো-বা কিছু অকালপক্কতারও। এই প্রশ্ন ও বিতর্কের স্বভাবটির সুফল দেখা গেছে দিলীপের পরবর্তী জীবনে। এই প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করব।

মাত্র ষোলো বছর বয়সে বাবাকে হারিয়ে মামার বাড়িতে আশ্রয় পেলেন দিলীপ। সেখানেও তাঁর আদর-যত্নের কোনো ত্রুটি হয়নি। আর্থিক সচ্ছলতায় লালিত হয়েছেন বরাবর। তাঁর মামার বাড়ি ছিল কলকাতার অন্যতম ধনী পরিবার। থিয়েটার রোডে তাঁদের বাসস্থান প্রাসাদতুল্য। হয়তো এই কারণেই বাস্তব জগতের দুঃখ-দৈন্য সম্বন্ধে কিছুটা উদাসীন ছিলেন দিলীপকুমার। তবে একথাও সত্য, যে বিষয়লালসা তাঁর মনকে কোনোদিন অধিকার করতে পারেনি। খুব অল্প বয়সেই সাধারণ ধনসম্পত্তি বা সংসারজীবনের প্রতি নিরাসক্তি এসেছিল। তাঁর জীবনের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল সঙ্গীত ও অন্যান্য বিদ্যার সাধনা এবং আধ্যাত্মিক চিন্তা। মনের দিক থেকে ছিলেন উদার ও বন্ধুবৎসল; অন্যের প্রতিভা ও অসাধারণত্বকে স্বীকৃতি দিতে সদাই তৎপর।

প্রেসিডেন্সি কলেজে ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স ক্লাসে ভর্তি হলেন দিলীপকুমার। সহপাঠী হিসেবে পেলেন অগ্নিসম উজ্জ্বল

তরুণ সুভাষচন্দ্রকে। তিনি অবশ্য আর্টস ক্লাসের ছাত্র। দু'জনের আলাপ ও বন্ধুত্ব ক্রমশ রূপ নিল প্রগাঢ় আকর্ষণে।

প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র-গোষ্ঠী'র বৈঠকেও দিলীপকুমার যাতায়াত করতেন। এই বিদগ্ধ লেখক ও সম্পাদকের প্রভাবেই তিনি ফরাসি ভাষা শিখতে আগ্রহী হয়েছিলেন। 'সবুজপত্রে'-র আড্ডায় তাঁর পরিচয় হল সত্যেন্দ্রনাথ বসু, নীরেন্দ্রনাথ রায় ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো কীর্তিমান যুবকদের সঙ্গে। পরবর্তীকালে বাংলা শিল্প-সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চা দীপ্ত হয়েছে তাঁদের প্রতিভার আলোয়। দিলীপকুমারের মামার বাড়িতে তাঁর বন্ধুদের ছিল অবারিত দ্বার। 'সবুজপত্র-গোষ্ঠী'-র মধ্যে তাঁর সবচেয়ে বেশি বন্ধুত্ব হয়েছিল তরুণ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন আজীবন দিলীপের অনুরাগী ও শুভাকাঙ্ক্ষী। তাঁর জন্য সুন্দরী পাত্রীর খোঁজ চলছে জানতে পারলেই দিলীপকুমার সভয়ে আশ্রয় নিতেন সত্যেন্দ্রনাথের উত্তর কলকাতার আবাসে। দিলীপ নিজেই স্মৃতিকথায় এই কৌতুককর প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন।

সুভাষচন্দ্র বসুর প্রভাব দিলীপের জীবনে সুগভীর; অতিকথনে কিঞ্চিৎ ভারাক্রান্ত তাঁর সুদীর্ঘ স্মৃতিচারণায় সম্ভবত সবচেয়ে বেশি এসেছে সুভাষচন্দ্রের প্রসঙ্গ। যৌবনেই সুভাষের চরিত্রে যে আত্মসংযম, গাম্ভীর্য ও পবিত্র দেশানুরাগের বিকাশ দেখেছিলেন তাকে দিলীপকুমার শ্রদ্ধা করতেন। তুলনায় তিনি নিজে অনেকটাই চপলস্বভাব ও উচ্ছ্বাসপ্রবণ, যার জন্য মাঝে মাঝে বন্ধুর কাছে তিরস্কৃত হয়েছেন। কিন্তু স্বভাবে কিছু অমিল থাকলেও আধ্যাত্মিক আদর্শ ও স্বদেশপ্রীতিতে এই দুই সমবয়সী বন্ধুর মন অনেকটাই এক সুরে বাঁধা। অন্তত দিলীপকুমার তাই মনে করতেন। সুভাষের জীবনের বহু উত্থান-পতন, সংগ্রাম ও রাজনৈতিক মোহভঙ্গের তিনি সাক্ষী। এমনকী ত্রিপুরী কংগ্রেসের অবমাননাকর ঘটনার পরে যখন সুভাষচন্দ্র মানসিকভাবে পীড়িত ও ক্লান্ত, তখন দিলীপ বন্ধুকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর সঙ্গে পণ্ডিচেরির অরবিন্দ আশ্রমে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসতে। উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলেন, একবার আশ্রমের শান্তির আস্বাদ পেলে তাঁর পক্ষে আর জন-অরণ্যের মাঝে ফিরে আসা কঠিন। ভারতবর্ষের এই কঠিন সময়ে তিনি রাজনীতির আঙিনা ছেড়ে সরে যেতে পারেন না।

এসব ঘটনা অবশ্য অনেক পরের কথা। দিলীপ তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, মিশুকে স্বভাবের জন্য সত্যেন বসু যতটা জনপ্রিয় ছিলেন থিয়েটার রোডের বাড়িতে, সুভাষ মোটেই ততটা নন। সত্যেনের মধ্যে সকলকে আন্তরিকভাবে কাছে টেনে নেওয়ার যে স্বভাবটি আছে, সুভাষের তা নেই— এমন অনুযোগ করেছিলেন দিলীপের স্নেহশীলা মেজ মামিমা। দিলীপ তখন বন্ধুর হয়ে ওকালতি করতেন। বলতেন সুভাষও 'অপরূপ' সত্যেনের মতোই, তবে ভিন্ন কারণে।

কেম্ব্রিজে দু'জনেই ছিলেন Fitzwilliam Hall-এর ছাত্র। দিলীপ বিদেশে যান গণিতে উচ্চশিক্ষার জন্য আর সুভাষচন্দ্র গিয়েছিলেন ICS-এর পরীক্ষার্থী হিসেবে। সেখানে আমোদ-প্রমোদে বিমুখ, এমনকি ইংরেজি নাটক নভেলের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, রাজনীতি ও ইতিহাসের একাগ্র পাঠক সুভাষচন্দ্রের এক মনোরম বর্ণনা দিয়েছেন দিলীপ তাঁর স্মৃতিকথায়।

গণিতে ট্রাইপস পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলেও জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটান দিলীপকুমার বেশ কিছুকাল। আই.সি.এস. পরীক্ষা দেওয়ার সংকল্প তিনি ত্যাগ করেন সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে। কয়েকজন বন্ধুর পরামর্শে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য লন্ডনের Lincoln's Inn-এ নাম লিখিয়েছিলেন; তারপরে একসময়ে ইচ্ছা হল Chartered Accountancy পড়ার। বিচিত্র বিষয়ে আগ্রহ ও চঞ্চল স্বভাব তাঁর চিত্তবিক্ষেপ ঘটাচ্ছিল। কিন্নরকণ্ঠের অধিকারী ও অতি সুগায়ক এই তরুণ তখনও উপলব্ধি করেননি, যে সঙ্গীতেই তাঁর জীবনের চরিতার্থতা। সেই কথাটি তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র এবং অবশেষে রবীন্দ্রনাথ; যিনি সেই সময় ছিলেন ইংল্যান্ডে। দিলীপকে তিনি বলেছিলেন—'বলো কি হে? শেষে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট—তুমি? পাঁচশো পাউন্ড জমা দিয়ে articled হবে? দিলীপ! দিলীপ! You are the limit'! হিন্দুস্তানী সঙ্গীতে তিনি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীত শিক্ষা ও অনুশীলনের জন্য দিলীপকুমার ইংল্যান্ড থেকে জার্মানি যান। ভ্রমণ করেন ইউরোপের অন্যান্য দেশেও। জার্মান জাতির সঙ্গীতপ্রীতি দিলীপকুমারকে মুগ্ধ করে। ইউরোপীয় শাস্ত্রীয় ও অন্য গানে সযত্নে তালিম নিয়েছিলেন তিনি। অচিরেই গাইতে শুরু করেন জার্মানির নানা সভাসমিতিতে। দিলীপকুমারের অপরূপ সুকণ্ঠ, নানা ভাষায় পারদর্শিতা ও তাঁর মধুর ব্যক্তিত্ব জার্মানির সঙ্গীত

গানের সূত্রেই দিলীপকুমারের খ্যাতি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে। স্বয়ং মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। দু'জনের এই সাক্ষাৎ ঘটে গোপনে। মানবেন্দ্রনাথ তাঁর লেখা 'India in Transition' বইটি দিলীপকে দিয়েছিলেন এবং অনুরোধ করেছিলেন, মস্কোয় গিয়ে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার অবস্থা দেখে আসতে। এ বিষয়ে দিলীপ তাঁর আত্মজীবনীতে লেখেন —'সে-সময়ে আমি ভগবানের কথা প্রায় ভুলে বসে জল্পনা-কল্পনা করছি - রুশদেশে গিয়ে দেখে আসব সেখানে কী নবরাজ্যের পত্তন করছে বলশেভিক আদর্শবাদী তরুণ- তরুণীরা।...' ঈশ্বরবিশ্বাসী এক সাধকের কাছ থেকে এই স্বীকারোক্তি পরম বিস্ময়কর।

রসিকদের কাছে খুবই সমাদৃত হয়েছিল। সেদেশের অনেক তরুণ-তরুণীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রচিত হয়।

এই গানের সূত্রেই দিলীপকুমারের খ্যাতি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে। স্বয়ং মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। দু'জনের এই সাক্ষাৎ ঘটে গোপনে। মানবেন্দ্রনাথ তাঁর লেখা 'India in Transition' বইটি দিলীপকে দিয়েছিলেন এবং অনুরোধ করেছিলেন, মস্কোয় গিয়ে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার অবস্থা দেখে আসতে। এ বিষয়ে দিলীপ তাঁর আত্মজীবনীতে লেখেন —'সে-সময়ে আমি ভগবানের কথা প্রায় ভুলে বসে জল্পনা-কল্পনা করছি - রুশদেশে গিয়ে দেখে আসব সেখানে কী নবরাজ্যের পত্তন করছে বলশেভিক আদর্শবাদী তরুণ-তরুণীরা।...' ঈশ্বরবিশ্বাসী এক সাধকের কাছ থেকে এই স্বীকারোক্তি পরম বিস্ময়কর।

সাময়িকভাবে রাশিয়ায় যেতে উৎসুক হলেও শেষ পর্যন্ত কিন্তু দিলীপের ইচ্ছার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান ওলগা নামে তাঁর এক রুশ বান্ধবী। ধর্মপ্রাণা এই তরুণী ছিলেন টলস্টয়ের বন্ধু পল বিরুকফের কন্যা। তাঁর শান্ত, দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও কোমল ব্যবহার দিলীপকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। ওলগা তাঁকে বলেন, বলশেভিকরা যেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন, মানুষের প্রকৃত কল্যাণ তাঁদের দ্বারা সম্ভব নয়। 'এ-পথে মানুষের মুক্তি নেই —বলেছেন স্বয়ং খৃষ্ট ও টলস্টয়। তবে? তবে কোন ভ্রান্তি-বিলাসের মোহে আমি নাস্তিকদের মোহে পড়ছি?... ভগবানকে বরখাস্ত করে ভোগবাদের পথে মানুষের পরম মুক্তি হতে পারে একথায় ও কানে আঙ্গুল দিত।' একথায় কোনো সারবত্তা থাক বা নাই থাক দিলীপের ঈশ্বরবিশ্বাসী মন এ যুক্তিতে সায় দিয়েছিল। যদিও তিনি স্বীকার করেছেন মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর রচিত গ্রন্থটি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

ভাববাদী দর্শন ও বস্তুবাদী বিশ্লেষণের মধ্যে দ্বন্দ্ব দিলীপের জীবনে কোনো নতুন ঘটনা নয়। এখানে তাঁর বান্ধবীর ইচ্ছার কাছে তিনি পরাজয় স্বীকার করলেন বলা যেতে পারে, এবং ওলগার ধারণা কতটা সত্য সে বিষয়ে কোনো চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়ার সুযোগ তাঁর হল না। রুশদেশে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে দিলীপ নিজেকে এক তাৎপর্যময় অভিজ্ঞতার আস্বাদ থেকে বঞ্চিত করলেন।

ইউরোপে জীবনের একটি সার্থক সময় দিলীপকুমার কাটিয়েছিলেন রোম্যাঁ রোলাঁ (Romain Rolland) ও বার্ট্রান্ড রাসেলের (Bertrand Russell) মতো মনীষীর সান্নিধ্যে। রোলাঁর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ১৯২০ সালের জুলাই মাসে, এবং দ্বিতীয়বার দেখা ১৯২২ সালের আগস্টে। সমাজে শিল্পীর অবস্থান ও শিল্পীর সামাজিক বিবেক সম্বন্ধে রোলাঁকে তিনি বহু প্রশ্ন করেন। যে সমস্ত বাস্তববাদী সমালোচক মনে করেন দুঃখ-কষ্টে পীড়িত সংসারে আত্মমগ্ন শিল্প সাধনার কোনো স্থান নেই, তাঁদের সম্ভাব্য প্রশ্নগুলি তিনি রেখেছিলেন রোলাঁর কাছে। সংসারের প্রতি নির্লিপ্ত মানুষটি সারা জীবন সঙ্গীতের ও ভাবের জগতে কাটাবেন বলেই যেন পরখ করে দেখতে চেয়েছিলেন এ বিষয়ে তাঁর নিজের ধারণা কতটা যুক্তিসঙ্গত।

রোম্যাঁ রোলাঁ ছিলেন গভীরভাবে মানব দরদী, তারই সঙ্গে সাহিত্য ও সঙ্গীতের পরম অনুরাগী। তিনি বিশ্বাস করতেন, সমাজে দুঃখকষ্টের নিরসনে শিল্পের ভূমিকা গৌরবময়। তিনি দিলীপকে বলেন, যে এক সময়ে স্বচক্ষে দেখেছেন কেমন করে

শ্রমজীবী মানুষ সারাদিনের পরিশ্রমের পরে উন্মুখ থাকে অভিনয় ও সঙ্গীতের রসাস্বাদনের জন্য। 'তাছাড়া, সমাজের উন্নত অবস্থায় শিল্পের যে দাম, মানুষের দুঃখ-কষ্টের বাহুল্যে শিল্পের দাম তার চেয়ে কোন মতেই কম নয়, বরং বেশি। কারণ, বহির্জগতে মানুষের দুঃখ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে অন্তর্জগতের সান্ত্বনার দামও যে বেড়ে ওঠে - নয় কি?' এবং সব মানুষের পক্ষে যেহেতু সব কাজ করা সম্ভব নয়, অন্যরা যেমন নিজের শ্রম দিয়ে মানুষের সেবা করে, শিল্পীও তেমনি নিজের সৃষ্টিকে দান করে মানুষের কল্যাণের জন্য। সেখানে তার কর্তব্যও অবশ্যপালনীয়। রোলাঁ একথাও বলেন, যে 'কোনো মহৎ শিল্পী সমাজে অন্যায় ও অবিচারের প্রতি নির্লিপ্ত থাকতে পারে না।... সমাজের যে-কোনো অত্যাচার বা গ্লানি তাঁর সৌন্দর্যবোধকে আঘাত করে।' অন্য সমস্ত বস্তুবাদী আনন্দের চেয়ে শিল্প সম্ভোগের আনন্দের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই, যে সেই আনন্দরসে শ্রেণি-নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার আছে।

রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে দিলীপকুমার রায়ের আলোচনায় কেবল শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে নয়, সাধারণভাবে মানব সভ্যতার স্বরূপ সম্বন্ধেও নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটেছে। দিলীপের একটি প্রশ্নের উত্তরে রোলাঁ বলেন—'এ জগৎ প্রগতিশীল, একথা তো বলা যায় না। বরং উল্টো : ইতিহাস আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, মানুষ ওঠে, আবার পড়ে।'

তাঁদের দীর্ঘ আলাপ হয়েছে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভাবধারা, টলস্টয় ও টুর্গেনিভের রচনা নিয়ে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত নিয়ে। দিলীপকুমারের গাওয়া গান রোলাঁর প্রিয় ছিল এবং তিনি নিজেও ছিলেন পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এক উচ্চমানের বোদ্ধা। রোম্যাঁ রোলাঁর সঙ্গে দীর্ঘ পত্রালাপও হয়েছে দিলীপকুমারের। তাঁকে লেখা রোলাঁর শেষ চিঠির তারিখ ২৮ জুন, ১৯৩৩।

ইউরোপের আর এক বিশ্ববিখ্যাত মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেলের সঙ্গে দিলীপকুমারের প্রথম আলাপও সুইজারল্যান্ডে; লুগানো শহরে। সেখানে 'নারীজাতির আন্তর্জাতিক শান্তিসংঘে' রাসেল চীন সম্বন্ধে ভাষণ দিয়েছিলেন। রাসেলের লেখার মুগ্ধ পাঠক ছিলেন দিলীপকুমার। রাসেলের রসবোধ ছাড়াও এই যুক্তিবাদী মনস্বীর চিন্তাধারায় প্রচ্ছন্ন একটি অতীন্দ্রিয় চেতনা দিলীপকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করত। দিলীপ বলেছেন, রাসেল এই অতীন্দ্রিয় (mystic) অনুভূতিকে দমন করতে চাইতেন, কারণ তাঁর কাছে যুক্তি বা বুদ্ধির পথই ছিল শ্রেষ্ঠ।

১৯২২ সালে ইউরোপে পর্যটনের সময়ে ভিয়েনা থেকে লেখা একটি চিঠিতে রাসেলকে দিলীপকুমার প্রশ্ন করেন, ভারতবর্ষের মতো দরিদ্র ও পরাধীন দেশে শিল্পচর্চা কতদূর সঙ্গত? এর উত্তরে রাসেল যা লেখেন, তা অনেকটা এ বিষয়ে রোলাঁর বক্তব্যের অনুরূপ। সকল মানুষেরই উচিত তার চরিত্রের শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাকে জীবনের মধ্য দিয়ে প্রস্ফুটিত করে তোলা। তাহলে শিল্পীই বা কেন তা করবেন না?

১৯২৭ সালের গ্রীষ্মকালে রাসেলের আমন্ত্রণে ইংল্যান্ডের কর্নওয়ালে (Cornwall) তাঁর বাসস্থানে অতিথি হয়েছিলেন দিলীপকুমার। সেখানে তাঁদের বেশ কয়েকদিনের কথোপকথন যেমন সরস, তেমনই বৈচিত্র্যময়। অকপটে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আলোচনা করেন দুজনে। সদ্য ঘটে যাওয়া রাশিয়ার বিপ্লব ও সেখানকার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে লক্ষ করা যায়, রাসেলের তুলনায় দিলীপকুমারই বলশেভিক মত সম্বন্ধে অধিক আশাবাদী, অন্তত সে-সময়ে। কিন্তু মানুষের মনের উপরে একটি মতবাদ জোর করে আরোপ করার এবং পুরানো ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার যে বলশেভিক প্রবণতা, তা শেষ পর্যন্ত সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নয় বলেই মনে করতেন বার্ট্রান্ড রাসেল।

নিরীশ্বরবাদী ও যুক্তির অনুসারী রাসেল অস্বীকার করেন মানুষের জীবনে ধর্মের সদর্থক প্রেরণাকে বা মৃত্যুর পরে চৈতন্যের অস্তিত্বকে। তাঁদের কথাবার্তা বিশেষভাবে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে যখন রাসেলকে দিলীপকুমার প্রশ্ন করেন —

'কিন্তু কোথাও কিচ্ছু নেই - ভাবতে ভালো লাগে?'

'চিরদিন বেঁচে থাকব ভাবতেই কি ছাই ভালো লাগে?'

একটু আশ্চর্য হয়ে বললাম : 'কেন মিষ্টার রাসেল? জীবনটা কি আপনার কাছে ভালো লাগে না?'

'সেটা আমার মেজাজের উপর নির্ভর করে। কখনো-কখনো জীবনটা মন্দ লাগে না। আবার অনেক সময়ে মনে হয় যে জীবনটা মোটেই সুবিধের নয়।...'

রাসেলের সরস সত্যবাদিতা আমাদের মুগ্ধ করে অবশ্যই, তবে দিলীপকুমারের সহজাত ঈশ্বরবিশ্বাস নিশ্চয়ই আঘাত পেয়েছিল রাসেলের কঠোর যুক্তিপূর্ণ মতামতে। কিন্তু তাতে

তিনি একটুও বিরূপ হননি, কারণ কৌতুকবোধ ও পরিহাসপ্রীতিও ছিল দিলীপের সহজাত। তাই সাগ্রহে আরও বহু প্রশ্ন করেছেন, পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনেছেন এই বিশিষ্ট চিন্তানায়কের বক্তব্য। তার চেয়েও বড়ো কথা, সংক্ষিপ্ত কিন্তু অতি সুলিখিত এই স্মৃতিচারণে রাসেলের চিন্তাধারার এক মনোজ্ঞ পরিচয় রেখে গেছেন তিনি।

বহু বছর পরে আবার রাসেলের সঙ্গে দিলীপকুমার দেখা করেন ১৯৫৩ সালে, ইংল্যান্ডে। সেবার দিলীপের সঙ্গে ছিলেন তার শিষ্যা ইন্দিরা। এখানে উল্লেখযোগ্য, যে সেবার তিনি রাসেলের সঙ্গে সব কথাবার্তার বিবরণ লিখতে খুব আগ্রহ বোধ করেননি। ততদিনে তিনি অরবিন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন, তাঁর আস্তিক্যের বোধ যৌবনের তুলনায় প্রগাঢ় ও নিশ্চিততর হয়েছে। কিন্তু রাসেলের প্রতি তাঁর অনুরাগ তাতে ক্ষুণ্ণ হয়নি এতটুকুও। বরং তিনি লেখেন - 'যে অভীপ্সা - desire - লর্ড রাসেলকে আমাদের সঙ্গে এক যোগসূত্রে বেঁধেছে তার নাম - এক নবজগতের আশা — হয়তো দুরাশা।' আর রাসেলও একটি কথা বলেন যা বিশেষভাবে দিলীপের মনের মতো—'শুধু যুক্তির খেয়ায় অধম কি উত্তম কারুর তারণ হতে পারে একথা যে বলে তাকে আর যা-ই বলা যাক না কেন, যুক্তিবাদী বলা যায় না—কেন না যুক্তিই সব আগে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় মানুষ স্বভাবে কী অসম্ভব অযৌক্তিক।'

রাসেলও একটি কথা বলেন যা বিশেষভাবে দিলীপের মনের মতো—'শুধু যুক্তির খেয়ায় অধম কি উত্তম কারুর তারণ হতে পারে একথা যে বলে তাকে আর যা-ই বলা যাক না কেন, যুক্তিবাদী বলা যায় না—কেন না যুক্তিই সব আগে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় মানুষ স্বভাবে কী অসম্ভব অযৌক্তিক।'

'তীর্থঙ্কর' গ্রন্থে পাঁচজন মনীষীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথন নিষ্ঠার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেন দিলীপকুমার। এঁদের মধ্যে দুজন বিদেশী - রোম্যাঁ রোলাঁ ও বার্ট্রান্ড রাসেল। বাকী তিনজন ভারতীয় - রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী ও শ্রী অরবিন্দ—যাঁর কাছে দিলীপ ধর্মসাধনায় দীক্ষা নিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার বিবরণ অপেক্ষাকৃত সুদীর্ঘ। দিলীপকুমারের পিতা দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ও অন্তরঙ্গ সুহৃদ। দুর্ভাগ্যবশত, পরবর্তীকালে এই সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা এসেছিল এবং তিনি কবির প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন। মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে প্রয়াত হন দ্বিজেন্দ্রলাল। দিলীপকে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট স্নেহ করতেন, নিজের স্বাভাবিক উদারতায় দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে পুরনো মনোমালিন্যের ইতিহাস তিনি মনে রাখতে চাননি। কোনো কোনো বিষয়ে মতের ও রুচির অমিল থাকা সত্ত্বেও দিলীপের সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রতিভা সম্বন্ধে কবি সচেতন ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বহুবার দিলীপকুমারের অবাধ দেখাসাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। তিনি কবির অতিথি হয়েছেন শান্তিনিকেতনে বা জোড়াসাঁকোয়, কখনো কালিমপঙে অথবা বরানগরে প্রশান্ত মহলানবিশের বাড়িতে। তাঁদের কথালাপের অনেকখানি অংশ অধিকার করে আছে গানের প্রসঙ্গ। বস্তুতঃ সঙ্গীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান মতামতের অনেকটাই আমরা জেনেছি দিলীপকুমারের সঙ্গে তাঁর আলোচনার কল্যাণে। কবিও এ বিষয়ে দিলীপের ভূমিকার সানন্দ স্বীকৃতি জানিয়ে লিখছেন —'দিলীপকুমারের একটি মস্ত গুণ আছে, তিনি শুনতে চান, এই জন্যই শোনবার জিনিস তিনি টেনে আনতে পারেন। শুনতে চাওয়াটা অকর্মক পদার্থ নয়, সেটা সকর্মক। তার একটা নিজের শক্তি আছে, বলবার শক্তিকে সে উদ্বোধিত করে। যে মানুষ বলে তার পক্ষে সে বড় কম সুযোগ নয়। কেননা বলার দ্বারাই আপন মনের সঙ্গে আমাদের সত্যকার পরিচয় হয়। দিলীপকুমার অনেক সময়ে আমাকে এই আত্মচিন্তা- আবিষ্কারের আনন্দ দিয়েছেন।'

গানের মধ্যে সুর ও কথার অর্ধনারীশ্বর মূর্তি দেখতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ কথা যেমন সুরকে অতিক্রম করে যাবে না, সুরও তেমনই প্রাধান্য বিস্তার করবে না কথার উপরে। দিলীপকুমার কিন্তু মনে করেন, সঙ্গীতে সুরের আর একটু বিস্তার, আরও 'সুরের সমৃদ্ধি' থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ

'ললিত-কলায় একান্ত সারল্য কি অনেকটা রিক্ততারই সামিল নয়?' এখানে দিলীপকুমারের পক্ষপাতিত্ব লক্ষ করতে রবীন্দ্রনাথের অসুবিধা হয় না। তিনি উত্তরে বলেন — 'একান্ত' বিশেষণের যোগে যে-কথাটা বলছ ভাষান্তরে সেটা দাঁড়ায় এই যে, সুরের দূষণীয় সরলতা দোষের, যেন সুরের দূষণীয় বাহুল্য দোষের নয়। অর্থাৎ বাহুল্যের দিকে দোষটা তোমার সহ্য হয়, সারল্যের দিকের দোষটা তোমার অসহ্য।'

রবীন্দ্রনাথ বলেন, যে কোনো শিল্পে রূপের পরিপূর্ণতা আসে প্রাচুর্যের দ্বারা নয়, অতি সহজ ও লাবণ্যময় একটি পরিমিতি তার বাহন। দিলীপকুমার এবার রীতিমতো তর্কের মেজাজে। তাঁর বক্তব্য, সব শিল্পের বিকাশ যে সহজ ও সরল হবে তেমন কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। কোনো কোনো শিল্প যে জটিল হয়েও সুন্দর হতে পারে, ইউরোপীয় সঙ্গীতের হার্মনি (Harmony), বা ইউরোপীয় স্থাপত্য কি তার দৃষ্টান্ত নয়?

কিন্তু কবির আজীবন বিশ্বাস ছিল যে মহৎ শিল্পের অন্যতম লক্ষণ তার আয়োজনহীন সরলতা। দিলীপের সঙ্গে বিতর্কেও তিনি সে বিশ্বাস থেকে সরে আসেননি। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে জোড়াসাঁকোয় অনুষ্ঠিত একটি সাক্ষাৎকারে দিলীপকুমারকে বাংলা গানের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিজের অপরিমেয় আশার কথা শোনালেন রবীন্দ্রনাথ। কবির ইচ্ছা, দিলীপ ও তাঁর সমকক্ষ শিল্পীরা তাদের সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তি, প্রতিভা ও অনুরাগকে প্রয়োগ করবেন বাংলা গানে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টিতে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক সঙ্গীত শিক্ষার সফলতা সম্বন্ধে তাঁর মনে সংশয় ছিল। নিজের গানে গায়ককে সুরবিহারের (improvisation) স্বাধীনতা দিতেও তাঁর যথেষ্ট আপত্তি, কারণ তিনি চান না যে সে স্বাধীনতার অপব্যবহার হোক।

সঙ্গীত সম্বন্ধে দিলীপকুমার-রবীন্দ্রনাথ বিতর্কের মূলে ছিল এই সুরবিহারের প্রশ্নটি। দিলীপ রবীন্দ্রনাথকে বলেন, যে ভারতীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীত যে এখনো প্রতিভাবান শিল্পীর এত কণ্ঠে জীবন্ত হয়ে ওঠে, তার আবেদন যে এখনো নিষ্প্রভ হয়নি, শিল্পীর এই যথেষ্ট সুরবিহারের ক্ষমতাই হয়তো তার কারণ। অতএব যোগ্য-অযোগ্যের বিচার না করে এই স্বাধীনতা সকল গায়ককেই দেওয়া উচিত।

এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যা বলেন, নিজের গান সম্বন্ধে তাঁর সেই উক্তিটি প্রসিদ্ধ এবং বহু- আলোচিত - '... আমিও স্বীকার করি যে সুরকারের সুর বজায় রেখেও এক্সপ্রেশনের কমবেশি স্বাধীনতা চাইবার এক্তিয়ার গায়কের আছে। কেবল প্রতিভা অনুসারে কম ও বেশির মধ্যে তফাত আছে এ-কথাটি ভুলো-না। প্রতিভাবানকে যে স্বাধীনতা দেব অকুণ্ঠে, গড়পড়তা গায়ক ততখানি স্বাধীনতা চাইলে না করতেই হবে।'

তবে এর সঙ্গে আরো কিছু কথা রবীন্দ্রনাথ সেদিন বলেছিলেন দিলীপকুমারকে, যা শুধু সঙ্গীত নয়, যেকোনো সৃষ্টি সম্বন্ধেই অত্যন্ত মূল্যবান। কবির মতে, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বা যে কোনো ধ্রুপদী শিল্পের মধ্যে একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর স্থিতির আদর্শ দেখা যায়। এই স্থিতি বাধা হয়ে দাঁড়ায় নতুন সৃষ্টির পথে। তাই সজীব মনের প্রাণশক্তি চিরদিন বিদ্রোহ করে ধ্রুপদী সৌন্দর্যের এই অচল রূপটির বিরুদ্ধে। তার কারণ, সেই প্রাচীন আদর্শকে আঘাত করার দ্বারাই তার সৃষ্টির উৎস আবার উৎসারিত হয়ে ওঠে। 'বাংলা গানে হিন্দুস্তানী সুরের শাশ্বত দীপ্তিই যে নবজন্ম পেয়েছে এ-কথা ভুললে তো চলবে না। আমরা যে বিদ্রোহ করেছি সে হিন্দুস্তানী সঙ্গীতের আত্মপ্রসাদের বিরুদ্ধে, গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে, তার আনন্দদানের বিরুদ্ধে না—কেননা আমাদের গানেও তো আমরা হিন্দুস্তানী গানের রাগরাগিনীর প্রেরণাকেই মেনে নিয়েছি। হিন্দুস্তানী সঙ্গীতকে আমরা চেয়েছি, কিন্তু আপনার করে পেলে তবেই না পাওয়া হয়।'

এমনভাবে অল্পবিস্তর মতান্তর গতিময় ও তাৎপর্যময় করে তোলে রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমারের আলোচনাকে, রেখে যায় অনেক চিন্তার অবকাশ উত্তর কালের জন্য। তাঁদের মতামতের সত্যকে বিচার করার সাধ্য আমাদের নেই। এবং সেই সত্য আপেক্ষিক। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হয়তো তাঁর নিজের সুরসৃষ্টি বা সাধারণভাবে বাংলা গানের বিষয়ে প্রযোজ্য। কিন্তু সুরের রাজ্যে দিলীপকুমারের বিচরণ কম অবাধ ছিল না। সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর প্রশ্ন ও উপলব্ধি উপেক্ষণীয় নয়, তারও নিজস্ব মূল্য আছে।

দিলীপকে অসংখ্য চিঠি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। ১৩৩২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে একটি চিঠিতে লেখেন—'তোমাকে আমি অন্তরের সঙ্গে স্নেহ করি। তোমার মধ্যে যে একটি বিশুদ্ধ সত্যপরতা ও সারল্য আছে তাতে আমার হৃদয়কে আকর্ষণ করে। আমার সঙ্গে তোমার কোনো ব্যবহারে যদি সেই সত্যের কোনো বিকার দেখতুম তাহলে সেই ধাক্কায় আমাকে সরিয়ে দিত। কখনো তা দেখিনি। অতএব আমার সম্বন্ধীয় কোনো কথায় তুমি মনে সংকোচ বোধ করো না।...'

দিলীপকুমারের সাহিত্য রচনা ও গদ্য কবিতায় ব্যবহৃত তাঁর আঙ্গিক ও ভাষার যে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এমন অবশ্য বলা যায় না। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কবির পত্রালাপ থেকে বোঝা যায় তিনি কি গভীর মনোযোগের সঙ্গে দিলীপের রচনারীতির অনুসরণ করতেন এবং কোনো লেখা ভালো লাগলে তার প্রশংসা করতেন অকুণ্ঠভাবে। ১৯৩৬ সালে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ দিলীপকে লেখেন—'তোমার রচনা উত্তরোত্তর জনাদর লাভ করছে। তার থেকে মনে হয় আমাকে যেটাতে গুরুতর বাধা দিচ্ছে আধুনিক শিক্ষিত পাঠকদের পক্ষে সেটা বাধা নয়। তাদের কাছে তোমার শক্তির রূপ যদি অবারিত ভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাহলে আমার বিচার নিয়ে তোমার আক্ষেপের বিষয় থাকবে না।... অন্তরের দিকে তোমার শক্তি যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছে—চিন্তা এবং কল্পনায় তোমার বাধা নেই।... অনেক সমালোচক তোমার ভাষাকে অতুলনীয় বলেন দেখেছি। তাঁরা এই যুগের প্রতিনিধি—তাঁদের মন যদি পেয়ে থাকো আমার কথায় ক্ষোভের কারণ নেই।...'

আর একটি চিঠি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন কবিতায়। ১৯২৭ সালের জানুয়ারি মাসে লেখা সেই পত্রটি এখানে উদ্ধৃত করি দিলীপের প্রতি তাঁর নির্মল, বিশুদ্ধ স্নেহের অমূল্য নিদর্শন হিসেবে —'বহুদিন কেন তব সহাস্য/দেখিনি অমল কমল আস্য ?/তব মুখ হতে /স্বর-সুধা স্রোতে/শুনি নি সরস ভাবের ভাষ্য ?/কেন যে তোমার এ-ঔদাস্য/অবশ্য করে/লিখো লিখো মোরে/কারণটা যদি হয় প্রকাশ্য।।...'

যে পাঁচজন মনীষীর সঙ্গে দিলীপকুমার তাঁর আলোচনা বিবৃত করেছেন 'তীর্থঙ্কর' গ্রন্থে, তাঁদের মধ্যে বলা যেতে পারে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গেই দিলীপের স্বভাবের মূল সুর ও জীবনসাধনার লক্ষ্যে অনৈক্য ছিল সবচেয়ে বেশি। তবুও গান্ধীজিকে নিয়ে লেখা অধ্যায়টি অতিশয় মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে দিলীপের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়। ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন গান্ধীজি পুণায় কারাবাসের পরে রোগশয্যায়, সেই সময় দিলীপ তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে যান এবং তাঁকে গেয়ে শোনান মীরার ভজন। সেই গান শুনে প্রসন্ন গান্ধীজি বলেন, সঙ্গীত তাঁর চিরদিন প্রিয়, অন্তরস্পর্শী প্রেরণা। দিলীপকুমার মন্তব্য করেন, তবে কি তাঁর নিরাভরণ কৃচ্ছ্রসাধনার জন্যই সাধারণ দেশবাসীর ধারণা হয়েছে যে তিনি শিল্প ও সঙ্গীতের বিরোধী ? মহাত্মা গান্ধী তা অস্বীকার করেন না, যদিও তাঁর মত হল, যে সরল সুষমা শিল্পের প্রাণ, সন্ন্যাসেই তার উচ্চতম বিকাশ। সন্ন্যাসী তার জীবনকেই রচনা করে শিল্পের মতো সুন্দরভাবে।

কিন্তু চিত্রকলার তত অনুরাগী নন গান্ধীজি, একথা অকপটে তিনি বলেন দিলীপকে। কারণ প্রকৃতির নদী অরণ্য পর্বতের সৌন্দর্য, তার দিনরাত্রি সকাল-সন্ধ্যার মহনীয় রূপ — কোনো শিল্পী কি কখনো পারবে তার সমকক্ষ কিছু সৃষ্টি করতে ? তাঁর কাছে তাই প্রকৃতি বা জীবনই হল শিল্পের সবচেয়ে বড় প্রেরণা, তুলি দিয়ে আঁকা কোনো ছবিতে তাঁর প্রয়োজন নেই।

অবশ্যই এই মতের বিপক্ষে ছিলেন দিলীপকুমার। কিন্তু ক্রমশ তিনি মুগ্ধ হন গান্ধীজির চরিত্রের সদর্থক বৈশিষ্ট্যগুলিতে। তাঁর সঙ্গে দিলীপের আবার দেখা হয় ১৯২৪ সালের নভেম্বরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে আয়োজিত একটি রাজনৈতিক সভায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, রাজাগোপালাচারী ও আরো কয়েকজন বিশিষ্ট দেশনেতা। সকলেই খদ্দরের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন—তর্ক-বিতর্কে উত্তপ্ত পরিবেশ। দিলীপ লিখছেন - '... একা মহাত্মাজি বসে নির্বাত সন্ধ্যার হ্রদের মতন শান্ত - তুফানের নামগন্ধও নেই - হাসিতে উজ্জ্বল, সংযমে স্নিগ্ধ, রহস্যে মধুর, যুক্তিতে প্রাঞ্জল। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, শেষটায় সবাইকে টানলেন দলে। অমন যে তেজস্বী দেশবন্ধু তাঁহাকেও গ্রহণ করতে হ'ল খদ্দর।...'

১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে যখন গান্ধীজি কলকাতায় শরৎচন্দ্র বসুর বাড়িতে অতিথি ছিলেন, সেসময় দিলীপকুমার তাঁকে প্রশ্ন করেন, হিন্দু-মুসলমানের মিলন ও সম্প্রীতি এ দেশে কোনপথে সম্ভব হবে। এই বছরের অক্টোবর মাসে তিনি এই প্রশ্নটি আবার রেখেছিলেন 'সীমান্ত গান্ধি' খান আবদুল গফর খানের কাছে; তখন গান্ধীজি খাঁ সাহেবের অতিথি হয়ে পেশোয়ারে অবস্থান করছেন। ওই সময়ে তাঁর বোন মায়াকে নিয়ে কাশ্মীর ভ্রমণে এসেছিলেন দিলীপকুমার —ভগ্নীপতির অকালমৃত্যুর পরে। গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যেই সুদূর পথ পাড়ি দিয়ে পেশোয়ারে আসেন তিনি।

ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক বিরোধের ফলেই যে শেষ পর্যন্ত গান্ধীজির জীবন বিপন্ন হবে, একথা কি তখনই কোনোভাবে অনুভব করেছিলেন দিলীপকুমার ? তা আজ আর বলা সম্ভব নয়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর প্রতি ক্রমশ তাঁর এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ গড়ে ওঠে। যদিও এই প্রায় সর্বজনপ্রিয় দেশনায়কের

রবীন্দ্রনাথকে এই বছরেরই ২২শে ডিসেম্বর একটি চিঠিতে তিনি লেখেন—'জীবনকে সার্থক করবার একমাত্র উপায় - জীবনাতীত কোন সত্তার পায়ে আত্ম্যোৎসর্গ করতে পারা। আর্ট আমার কাছে তত বড় মনে হচ্ছিল না যাতে করে আমার সব তার পায়ে দিতে পারি। নারীর প্রতি প্রেমও না, বন্ধুপ্রীতিও না, দেশভক্তি না। মনে হ'ত এ সবের চেয়েই বড় কোনো সার্থকতা নিশ্চয় আছে। অথচ কোনো প্রমাণ পেতাম না আমার মনে এ নিবিড় প্রতীতির।'

রাজনৈতিক মত ও পথের তিনি সমর্থক ছিলেন না। দিলীপকুমার লিখছেন - '... তাঁর চরকা, সেকেলিয়ানা, অহিংসা, প্রার্থনাসভায় জোর ক'রে উদার হবার চেষ্টা, হিন্দিভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করে দাঁড় করানোর অন্যায় আন্দোলন— এ সমস্তই আমাকে ব্যথিত ক'রে তুলত, আমার মনে হ'ত তিনি দূরদর্শী নন, তাঁর বুদ্ধিও স্তিমিত হয়ে আসছে দিনে দিনে।...' গান্ধীজির চিন্তাভাবনার ত্রুটি সম্বন্ধে তিনি নিজের ধারণার কথা লিখেছেন সংক্ষিপ্ত একটি চমৎকার বাক্যে - 'উৎকট রোগের জন্য সরল ঔষধের নির্দেশ দিলে তাতে ক'রে হয় শুধু বেচারী ঔষধেরি উপর অবিচার।' এবং তাঁর প্রাণের বন্ধু সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর বৈরিতা নিশ্চয়ই গান্ধীজিকে দিলীপের চোখে অপ্রিয় করেছিল। কিন্তু এত কিছুর পরেও গান্ধীজির চরিত্রের স্বাভাবিক মহত্ত্ব, তাঁর চমৎকার রসবোধ, নিজের চিন্তার উচ্চ স্তর থেকে নেমে এসে শ্রেণিনির্বিশেষে সকল মানুষের সঙ্গে মিশে যাবার বিরল ক্ষমতা—এমন নানা কারণে তাঁকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন দিলীপকুমার। নিয়মিত তাঁদের দুজনের পত্র বিনিময় হত। তবে ১৯৩৮ সালের পরে দীর্ঘ নয় বছর গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। দিলীপকুমার অকপটে লিখেছেন, রাজনৈতিক ও অন্যান্য নানা বিষয়ে মত পার্থক্য যেন তাঁকে কিছুটা দূরে সরিয়ে নিয়েছিল।

তাঁদের আবার সাক্ষাৎ হয় ১৯৪৭ সালে। সে বছর অক্টোবর মাসের শেষে দিল্লীর বিড়লা হাউসে গান্ধীজি'র প্রার্থনা সভায় কয়েক দিন দিলীপকুমার উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য সে সময়ে নিজের সুরারোপিত 'বন্দেমাতরম' গানটি গান্ধীজি'কে শোনানোই ছিল দিলীপের উদ্দেশ্য; তিনি চেয়েছিলেন 'বন্দেমাতরম' গানটি সদ্য স্বাধীন দেশের জাতীয় সংগীত হোক। কিন্তু তাঁর স্মৃতিকথার এই অংশটিতে তিনি আরো কিছু আলোচনা করেছেন যা বিষয় হিসেবে আজকের দিনেও তাৎপর্য হারায়নি।

প্রথম দিনেই দিলীপকুমার লক্ষ করেছিলেন গান্ধীজির প্রার্থনাসভায় পরিবেশের অস্বস্তিকর অস্বাভাবিকতা। অন্যান্য ধর্মপুস্তক থেকে আবৃত্তির পরে যখনই কোরান থেকে পড়া শুরু হল, অনেক শ্রোতার মধ্যে যেন স্পষ্ট একটি অসহিষ্ণুতা দেখতে পেলেন তিনি। বড় নিরুৎসাহ বোধ করলেন। পরের দিনের ঘটনাটি আরো চমকপ্রদ। আগের দিন যাঁরা কোরান পড়ার সময়ে আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদেরই মধ্যে একজন দিলীপের কাছে এসে নিজের মতের সমর্থন চাইলেন। বললেন, তিনি এখানে এসেছেন মহাত্মাজি'র বাণী শুনতে, কোরান শুনতে নয়। উত্তরে দিলীপকুমার যা বললেন তা শোনা যাক তাঁরই জবানিতে—'কিন্তু কোরানে আপনার যখন এতই আপত্তি তখন এখানে এলেন কি দুঃখে - বিশেষ জেনে শুনে যে মহাত্মাজি এখানে নিয়মিত কোরান পড়ান? যাই হোক গোল করবেন না, বসুন - তাঁকে আসতে দিন। এ-সভায় বিচারের ভার তাঁর - আমার নয়, মনে রাখবেন। ব'লে তার কাঁধে হাত দিয়ে বললাম নরম সুরে : 'আমি ভগবানের নাম গান করব - তা তো আপনি শুনবেন?' কিন্তু সেই ব্যক্তি তখনও তাঁর কোরান বিরোধিতায় অনড়। দিলীপ হেসে তাঁকে বলেন, 'কিন্তু বন্ধু, ভগবান তো শুনেছি একটিই।' এই ঘটনার অনুরণন আজকের দিনে যেন আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা উপলব্ধি করি অধ্যাত্মসাধক দিলীপকুমারের দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টি, তাঁর চিন্তার শুদ্ধতা।

এর দু'একদিন পরে গান্ধীজির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলেন দিলীপকুমার। সেই তাঁদের দেখা শেষবারের মতো। তিন মাস পরে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে গান্ধীজির মর্মান্তিক হত্যা যে দিলীপকুমারকে কতখানি আঘাত করেছিল, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

'হে চিরন্তন, থেকো হে আমার পাশে'

ঈশ্বর মহিমায় দিলীপকুমারের বিশ্বাস ছিল আজীবন। অল্প বয়স থেকেই আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জন্য আকণ্ঠ পিপাসা ছিল তাঁর। বহু বিদগ্ধ স্রষ্টা ও খ্যাতিমান মানুষের সাহচর্য পেয়েও এ পিপাসা সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয়নি। শেষ পর্যন্ত শ্রী অরবিন্দের আধ্যাত্মিক উপদেশে তিনি অভীষ্ট আনন্দ ও শান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন; ১৯২৮ সালে দিলীপ সংসার ত্যাগ করে পণ্ডিচেরি চলে যান। রবীন্দ্রনাথকে এই বছরেরই ২২শে ডিসেম্বর একটি চিঠিতে তিনি লেখেন—'জীবনকে সার্থক করবার একমাত্র উপায় - জীবনাতীত কোন সত্তার পায়ে আত্ম্যোৎসর্গ করতে পারা। আর্ট আমার কাছে তত বড় মনে হচ্ছিল না যাতে করে আমার সব তার পায়ে দিতে পারি। নারীর প্রতি প্রেমও না, বন্ধুপ্রীতিও না, দেশভক্তি না। মনে হ'ত এ সবের চেয়েই বড় কোনো সার্থকতা নিশ্চয় আছে। অথচ কোনো প্রমাণ পেতাম না আমার মনে এ নিবিড় প্রতীতির।'

দিলীপের আশ্রমবাসের সিদ্ধান্তে ব্যথিত হয়েছিলেন তাঁর বেশ কিছু আত্মীয় পরিজন ও কাছের মানুষেরা। তাঁদের মধ্যে অন্যতম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে দিলীপকুমারের ছিল বহুদিনের অন্তরঙ্গ স্নেহের সম্পর্ক। দিলীপের সঙ্গীত ও সাহিত্যসাধনার অশেষ মূল্য ছিল শরৎচন্দ্রের কাছে। আশ্রমের জীবনবিমুখ নীরস পরিবেশে দিলীপ সুখী হবেন না, এমনই ধারণা ছিল তাঁর। পণ্ডিচেরির কঠোর ধর্ম সাধনার বিধিনিষেধে যদি শুকিয়ে যায় দিলীপের প্রাণোচ্ছল মনটি, ক্ষীণ হয়ে যায় তাঁর গীতমুখর কলকণ্ঠ, এই তীব্র আশঙ্কা থেকে শরৎচন্দ্র তাঁকে লেখেন—'তোমার লেখার মধ্যে আজকাল আমি অনেক আশা অনেক ভরসা পাই। অথচ মনের মধ্যে বেদনা বোধ করি যে এ তুমি ছেড়ে দিলে। আশ্রমে বাস ক'রে সে-বস্তু কখনো হবে না। জীবনে যে ভালোবাসলে না, কলঙ্ক কিনলে না, দুঃখের ভার বইলে না, সত্যিকার অনুভূতির অভিজ্ঞতা আহরণ করলে না, তার পরের- মুখে-ঝাল-খাওয়া কল্পনা কত দিন সত্যিকার সাহিত্য যোগাবে?... নিজের জীবনটাই হোলো যার নীরস, বাংলা দেশের বাল-বিধবার মতো পবিত্র, সে প্রথম যৌবনের আবেগে যত কিছুই করুক, দু'দিনে সব মরুভূমির মত শুষ্ক শ্রীহীন হয়ে উঠবে। তাই ভয় হয়, ক্রমশ হয়ত তোমার লেখার মধ্যেও অসঙ্গতি দেখা দেবে।... আমি আরও একটা কথা ভাবতাম। মন্টু এই যে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, ও অনেক জাত অনেক সমাজ অনেক লোকের সঙ্গে বাংলা দেশের একটা স্নেহ ও শ্রদ্ধার বাঁধন বেঁধে দিচ্ছে।... মন্টুর সঙ্গে গেলে কোথাও আদরের অভাব ঘটবে না। কিন্তু সে-আশা সে-আনন্দে ছাই পড়লো।' প্রিয় 'মন্টু'র সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনা শরৎচন্দ্রের এ সময়ে লেখা চিঠিগুলিতে গোপন থাকেনি। '...তোমাকে যে অত্যন্ত স্নেহ করি এ মিথ্যে নয়। ভারি দেখতে ইচ্ছে হয় - গান শুনতে, গল্প করতে। ভারি বুড়ো হ'য়ে পড়েছি, আর কটা দিনই বা বাঁচবো, এদিকে আসবে না একবার?'

এমনকি সুভাষচন্দ্রেরও যে দিলীপকুমারের এই নিভৃতবাসে সমর্থন ছিল না তার আভাস পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথকে লেখা দিলীপের একটি চিঠিতে। রবীন্দ্রনাথ নিজে এ বিষয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সংযমের পরিচয় দিয়েছিলেন। দিলীপকে তিনি অসংখ্য চিঠি লিখলেও কোনোটিতেই তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণ সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করেননি। বরং অরবিন্দের প্রতি নানা সময়ে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। হয়তো মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দিয়েছেন, তাঁর নিজের সাধনার পথ ও প্রকৃতি ভিন্ন।

তবে সাহিত্য-সংস্কৃতির জগৎ থেকে বেশি দিনের জন্য দূরে থাকা সম্ভব ছিল না দিলীপের পক্ষে। সন্ন্যাস জীবনযাপনের মধ্যেও তিনি মাঝে মাঝেই চলে আসতেন কলকাতায়। থিয়েটার রোডে তাঁর মামার বাড়িতে গানের আসর জমাতেন পুরানো দিনের মতোই। নিমন্ত্রণ করতেন সঙ্গীতরসিক বন্ধুদের। সংসার ত্যাগ করলেও জীবনের আনন্দ ও স্বাধীনতাকে তিনি ত্যাগ করেননি। গৈরিক বেশধারী এই সাধকের অবাধ যাতায়াত ছিল কলকাতার নানা সাহিত্যিক সম্মিলনে। সমকালীন ও তরুণ প্রজন্মের লেখকদের নতুন সাহিত্যসৃষ্টি নিয়ে ছিল তাঁর তীব্র আগ্রহ। বিশেষত বুদ্ধদেব বসুর প্রতিভায় চমৎকৃত হয়েছিলেন দিলীপকুমার। রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে অনুরোধ করেন - 'বুদ্ধদেবের বন্দীর বন্দনায় দুটি কবিতা - 'বন্দীর বন্দনা' ও 'কোনো বন্ধুর প্রতি' পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। আপনি ওর সম্বন্ধ কেন কিছু বলেন না? দুচার লাইনও - লিখুন না।'

অবশ্য নবীন সাহিত্যিকদের লেখায় ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। রবীন্দ্রনাথকে লেখা কিছু চিঠিতে দিলীপ তাঁদের অকরুণ সমালোচনা করেছেন। রবীন্দ্রকাব্যে যে 'গভীর স্তব্ধতার, স্বর্গস্বপ্নের, ধ্যানদৃষ্টির রূপায়ণ' তার মর্ম সাহিত্যে এই আধুনিকপন্থীরা বোঝেননি, সেকথাও লিখেছেন অকপটে, ২৭শে জুলাই ১৯৩১ তারিখে - পণ্ডিচেরি থেকে লেখা একটি পত্রে। সাহিত্যিক লীলা মজুমদার বিবাহ সূত্রে ছিলেন দিলীপকুমার রায়ের আত্মীয়া। ১৯৩৯ সালে লীলাকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কই, তোমাদের বাড়িতে তো কখনো বুদ্ধদেব বোসকে দেখি না। ওকে কি তোমাদের ভালো লাগে না?' সেই কথা শুনে নিজের বাড়িতে অনুষ্ঠিত সাহিত্যসভায় বুদ্ধদেবকে প্রথমবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন লীলা; উভয়ের মধ্যে সখ্যের সূত্রপাত তখন থেকেই। এ প্রসঙ্গে লীলা মজুমদার লিখেছেন, 'ভারি বুদ্ধিমান ছিল বুদ্ধদেব; তাকে বন্ধু বলতে পেরে আমি গর্বিত।'

বুদ্ধদেব বসু নিজেও দিলীপকুমারের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার অকৃত্রিম অনুরাগী ছিলেন। পণ্ডিচেরিবাসী দিলীপের সঙ্গে তাঁর চিঠিতে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল, যা শেষ হয় একটি দুঃখজনক ঘটনায়। বুদ্ধদেব কোনদিনই দিলীপের কবিতার ভক্ত ছিলেন না, সম্ভবত কবিতার ছন্দ নিয়ে দু'জনের মতের অমিল ছিল। কিন্তু সে কথা স্বাভাবিক সংকোচবশত তিনি দিলীপকে জানাতে পারেন নি — 'যেহেতু আমি দিলীপকুমারকে শ্রদ্ধা করি ও ভালোবাসি, তাঁকে দুঃখ দিতে আমি চাই না, তাঁর প্রীতি আমি হারাতে চাই না...।' কিন্তু নীরেন্দ্রনাথ রায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে নিজের মনোভাব প্রায় বাধ্য হয়েই স্বীকার করেন তিনি। বন্ধু নীরেন্দ্রনাথের মাধ্যমে একথা জেনে অভিমানী দিলীপ ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। বুদ্ধদেবের সঙ্গে তাঁর বহুকালের মধুর সম্পর্ক নিমেষে ছিন্ন হয়ে যায়। অনুশোচনায় বিদ্ধ হয়ে তিনি হারানো সম্পর্ক উদ্ধার করার অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু স্পর্শকাতর দিলীপকুমার আর কোনোদিন তাঁর প্রতি প্রসন্ন হননি।

ধর্মের প্রবর্তনায় শেষ পর্যন্ত হয়তো এমন কিছু অলৌকিক ঘটনা ও সংস্কারে বিশ্বাসী হয়েছিলেন দিলীপকুমার, যা স্বাভাবিক যুক্তিবোধে আমরা মেনে নিতে পারি না। কিন্তু সেই প্রত্যয়ে তিনি পৌঁছেছিলেন অনেক প্রশ্ন ও সংশয়ের পরে, তাঁর ভাবুক মন ও তীক্ষ্ণ মেধার মধ্যে নিশিদিন অনেক দ্বন্দ্বের শেষে। দিলীপের বিশ্বাস যাই হোক না কেন, তাঁর মনের গড়নটি ছিল আধুনিক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন। রোলাঁ, রাসেল বা গান্ধীজির মতো যুগান্তকারী পুরুষরা দিলীপকুমারের সঙ্গে খোলা মনে মতবিনিময় করেছেন, কথা বলেছেন আনন্দের সঙ্গে, অনর্গল। তাঁরা নিশ্চয়ই দিলীপের বৈদগ্ধ্য ও মুক্তমনের প্রতিই অধিক আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাঁর ধর্মবিশ্বাসের প্রতি নয়। আর দিলীপকুমার সেই স্নেহ ও প্রীতির যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন পরম শ্রদ্ধা ও অনুভূতির সূক্ষ্মতায় সমৃদ্ধ তাঁর স্মৃতিবিবরণীতে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যকে গ্রহণ করতে তিনি বিলক্ষণ জানতেন। এ বিষয়ে কোনো সংকীর্ণতা তাঁকে স্পর্শ করেনি।

সুভাষচন্দ্র দিলীপকে বলেছিলেন, তাঁর চরিত্রে অহমিকা আছে, তাকে জয় করতে হয়তো আজীবন চেষ্টার প্রয়োজন; রবীন্দ্রনাথকে লেখা দিলীপকুমারের চিঠি, ২৫শে নভেম্বর ১৯২৫। তাঁর বন্ধু অহমিকা জয় করতে পেরেছিলেন কিনা তা আর নিশ্চিত জানা হয়নি সুভাষের, কারণ দেশোদ্ধারের কঠিন ব্রত নিয়ে তিনি চলে যান অজানা গন্তব্যে, দিলীপের অধ্যাত্মসাধনা পরিণতি লাভ করার আগেই। আর দিলীপ আশ্রমকে সর্বস্ব দান করে প্রায় নিঃস্ব হয়েছিলেন। যা সহজেই ভোগ করতে পারতেন সেই ঐহিক সুখ ও সংসারের অজস্র প্রেম-প্রীতির বন্ধন অবলীলায় ত্যাগ করেন তিনি।

এত কিছুর পরেও যা সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারেননি সে হল স্বভাব ও রুচির আভিজাত্য। একেবারে নম্র, অহংকারশূন্য হতে পারেননি। নির্দ্বিধায় অকপটে স্বীকার করেছেন নিজের চরিত্রের স্ববিরোধ ও ত্রুটিবিচ্যুতির কথা, আত্মনিয়ন্ত্রণে নিজের ব্যর্থতার কথা। এই অকপট ভাবটিই তাঁর সাধন-পথে উজ্জ্বল দীপ হয়ে জ্বলেছে। সে আলো অসীম দ্যুতি নিয়ে বিকীর্ণ হয়েছে তাঁর গানে। দিলীপকুমারের সঙ্গীতে এমন একটি স্বর্গীয় স্পন্দন ও সুষমা ছিল যা নিছক সঙ্গীত প্রতিভার অতিরিক্ত কোনো দুর্লভ প্রেরণার ফল—এ কথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হয় না।

দিলীপকুমারের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ অবশ্যই তাঁর গানে। গানের মধ্য দিয়েই তিনি বিলিয়েছেন 'অগ্নিলীলার সঞ্জীবনী', চিনেছেন 'আলোর দিশারী'-কে। তবে সেই দিব্যজীবনের আড়ালে রয়ে গেছে বহু মননধর্মী অন্বেষণ—হয়তো অসম্পূর্ণ বা অস্পষ্ট, কিন্তু চিরন্তন। তাঁর এই অপরূপ দ্বৈত সত্তা ভাবীকালের কাছে আজও প্রকাশের অপেক্ষায়।

নজরুল জীবনী: তুলনামূলক আলোচনা

শেখ কামাল উদ্দীন

(একটা সময় ছিল যখন আমাদের পাঠ-পরিসরে কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন খুবই উপেক্ষিত বিষয়। এখন অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হলেও সমস্যা রয়েই গেছে। নজরুল এখনো আমাদের বৌদ্ধিক ক্রিয়াশীলতার ক্ষেত্রকে সেভাবে দখল করতে পারছেন না। নজরুল-চর্চা সংশ্লিষ্ট এমন সীমাবদ্ধতার উপর আলোকপাত করেছেন প্রাবন্ধিক।)

মুখবন্ধ

"তবে বিদায় নেবার সময় হয়েছে। মেঘে মেঘে বেলা অনেক হল। পরবর্তী সংস্করণ দেখার জন্য আমি নাও থাকতে পারি। আমার সমবয়সী পরিচিত বন্ধুবান্ধব এমনকি আমার থেকে বয়সে ছোট তাঁরাও একে একে বিদায় নিচ্ছেন— আমি ক্রমশঃ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছি। জীবনতরী এখন ঘাটের কাছে এসে ঠেকেছে—"ওই শুনি যেন চরণধ্বনি রে শুনি আপন মনে"। আজহারউদ্দীন খান 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' গ্রন্থের সপ্তম সংস্করণের নিবেদন অংশে এই কথাগুলো লিখেছেন। এই অংশটি পড়ার পরই মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কেননা তাঁর এই আশঙ্কাই সত্যি হলো। ২০২২ ছিনিয়ে নিল বাংলায় নজরুল গবেষণার পথিকৃৎ আজহারউদ্দীন খানকে।

বাংলায় যাঁরা নজরুল জীবনী গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে আর একজন প্রথিতযশা নজরুল গবেষক, স্বনামধন্য অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। তিনি 'ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ'-এর প্রফেসর এমিরিটাস ছিলেন। ২০২২-এ তিনিও মর্ত্যভূমি ছেড়ে অমৃতলোকে যাত্রা করেছেন। তাঁর গ্রন্থের নাম সকল নজরুল-প্রেমীর মুখে মুখে ফেরে— 'নজরুল জীবনী'। বাংলাদেশে গ্রন্থটির একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে রফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন তাঁর "নজরুল-জীবনী' প্রণয়নে প্রায় পনের বছর সময় লেগেছে।" প্রকাশকাল ১৯৭২। এছাড়াও গ্রন্থটির একটি নজরুল ইনস্টিটিউট সংস্করণও প্রকাশিত হয়, ২০১৩-র একুশে গ্রন্থমেলায়। পরে ভারতীয় সংস্করণ পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয়, ২০১৬-র জুন মাসে।

'অবশ্যই বর্তমান জীবনীগ্রন্থ সে-সব সীমাবদ্ধতার প্রত্যাশিত প্রতিবিধান নয়, তবে জীবনী রচনার প্রণালীবদ্ধ পদ্ধতিবিদ্যা যথাসম্ভব অঙ্গীকার করাই এখানে লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। এতে নজরুলের বহু কবিতা, ভাষণ, চিঠিপত্রের বয়ান প্রায় অপরিবর্তিত বা অসংক্ষেপিত অবস্থায় তুলে দেওয়া হয়েছে।' অরুণকুমার বসু তাঁর 'নজরুল জীবনী' গ্রন্থের সূচনায় কথাগুলি বলেছেন। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা পুস্তক মেলায়, জানুয়ারি ২০০০ সালে। প্রকাশক 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি'।

কাজী নজরুল ইসলামের প্রামাণ্য জীবনী লেখা সহজ ছিল না। তিনি এক জায়গায় একটানা থাকেননি বা বলা ভালো থাকতে পারেননি। কোনো ব্যক্তি বা আত্মীয় তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের দিকগুলো লিপিবদ্ধ করে যাননি। তিনি নিজেও এ ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন বলে মনে হয় না। দরিদ্রতা তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল। ফলে প্রচুর ফরমায়েসী লেখা তাঁকে লিখতে হয়েছিল। সেগুলো সব উদ্ধার করা যায়নি। শেষ জীবন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে কাটে। কিছু লিখতে

বা বলে যেতে পারেননি। এইসমস্ত কারণে তাঁর জীবনী লেখা সহজ নয়। তৎসত্ত্বেও যাঁরা এই দুরূহ কাজটি করেছেন তাঁরাও সেকথা স্বীকার করে গেছেন তাঁদের গ্রন্থে। যেমন, আজহারউদ্দীন খান তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' নামের বিপুলায়তন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে লিখেছেন, 'কবির জীবন সম্পর্কে নানারূপ ভুয়ো গুজব আমাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। সেই গুজবকে বিশ্বাস করে আজও অনেক মহলে কবির বিরুদ্ধে বিকৃত প্রচার চলে। অনেকে আবার নিজ স্মৃতির মাধ্যমে কবিকে দেখতে চেষ্টা করেছেন— সেগুলি আরও বিপজ্জনক, কেননা তাতে কবির চেয়ে লেখকই নিজের মোড়লি করেছেন বেশি। এঁদের সত্যতা সবসময়ে গ্রহণ করতে বাধ-বাধ ঠেকে। তাই তাঁর সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা ঘটনা এমন জট পাকিয়ে রয়েছে সে সত্য-মিথ্যা বেছে একটা পাকা নির্ভরযোগ্য জীবনী লেখা কষ্টসাধ্য ব্যাপার।'

আলোচিত গ্রন্থমালা

আমরা এই প্রবন্ধে তিনটি নজরুল জীবনীর তুলনামূলক আলোচনা করবো। মূল উদ্দেশ্য, কোথায় কোথায় বৈপরীত্য বা অসংগতি সেগুলো দেখা এবং সে সম্পর্কে একটা যুক্তিগ্রাহ্য ঐক্যমতে পৌঁছানোর চেষ্টা করা। না হলে নজরুল-প্রেমীরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে সঠিকটা গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করবেন। যে গ্রন্থগুলো আমরা মনোনীত করেছি সেগুলো হলো—

১.'বাংলা সাহিত্যে নজরুল'- আজহারউদ্দীন খান। সুপ্রিম পাবলিশার্স, কলকাতা। সপ্তম সংস্করণ, ২০০৪ সাল।

২.'নজরুল-জীবনী'- রফিকুল ইসলাম। ওরিয়েন্টাল মিডিয়া ফোরাম, কলকাতা। প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, ২০১৬ সাল।

৩. 'নজরুল জীবনী'- অরুণকুমার বসু। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। কলকাতা। প্রথম সংস্করণ, ২০০০ সাল।

নজরুল সম্পর্কে যা জানি

কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে আমরা ছোট থেকে যা জেনে এসেছি তা'হলো— তিনি অবিভক্ত বর্ধমান জেলার চুরুলিয়াতে ১৮৯৯ সালের ২৪শে মে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ফকির আহমেদ, মাতা জাহেদা খাতুন। দারিদ্র্যের জন্য বেশিদূর পড়াশোনা করতে পারেননি। অল্প বয়সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করেন। সেখানে থাকতেই লেখালেখিতে তাঁর হাতে খড়ি। ফিরে এসে লেখালেখিতে আরও মনোনিবেশ করেন। যৌবনে 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখে 'বিদ্রোহী কবি' নামে খ্যাত হন। তারপর 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা লেখার জন্য এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারামুক্তির পর বিভিন্ন পেশার মানুষের সংগঠনগুলির প্রতি সহমর্মী হয়ে তাঁদের সম্মেলনগুলিতে যোগদান করেন। কবিতা ও গান লেখেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। এই সময়কালে তিনি বিবাহ করেন প্রমীলা সেনগুপ্তকে। তার আগে তাঁর প্রথম বিবাহ নিয়ে একটি বিতর্ক লক্ষ করি। ক্রমশ তিনি অল ইন্ডিয়া রেডিও, এইচ এম ভি রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। চার বছরের শিশুপুত্র বুলবুলের মৃত্যু তাঁকে মানসিকভাবে অনেকটাই বিক্ষত করে। অবশেষে ১৯৪২-এ অল ইন্ডিয়া রেডিও-তে অনুষ্ঠানে যুক্ত থাকা অবস্থাতেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই অসুস্থতা থেকে তিনি আর মুক্ত হতে পারেননি। ইতিমধ্যে ভারত ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। পাকিস্তানের বাংলাভাষী অংশ বাংলাদেশ নামে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয় কালক্রমে। কবিকে সে দেশে নিয়ে গিয়ে তাঁকে সে দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'একুশে পদক' দেওয়া হয় এবং 'জাতীয় কবি' হিসেবে ভূষিত করা হয়। এরপর কবি আর দেশে ফিরে আসতে পারেননি। সেখানেই তাঁর মৃত্যু এবং কবরস্থ হওয়া। এখন এই ঘটনাগুলি জীবনীকাররা কে, কীভাবে দেখেছেন ও লিখেছেন সেগুলিই আমরা এই প্রবন্ধে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করবো।

ক.জন্ম, বাল্য ও কৈশোর কথা

প্রায় সব জীবনীকারই জানিয়েছেন যে কবির জন্ম ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে মে, বাংলায় ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার। আজহারউদ্দীন খান এই তারিখ ও দিনে সহমত পোষণ করেছেন। কিন্তু রফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, কবির জন্ম- মঙ্গলবার। তাঁর কথায়, 'কাজী নজরুলের জন্ম তারিখ ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ২৪মে, মঙ্গলবার। এ তথ্য সর্বজনস্বীকৃত'। প্রথমেই গোল বাঁধলো কবির জন্ম বার নিয়ে। এবার দেখা যাক, অন্য জীবনীকাররা এ ব্যাপারে কি বলেছেন? অরুণকুমার বসু জানাচ্ছেন, 'কাজী

নজরুল ইসলামের জন্ম হয়েছিল ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মে, বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, সম্ভবত অপরাহ্নে।'

শিক্ষাজীবন

বালক বয়সে নজরুলের পড়াশোনার ব্যাপারে প্রায় প্রত্যেক জীবনীকারই একই রকম কথা বলেছেন। তিনি একটানা এক জায়গায় বেশি দিন পড়াশোনা করতে পারেননি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের সহায়তায় পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন। এই সময় বেশ কিছু মানুষের সদয় সহায়তা পেয়েছেন। তাঁদের সাহায্য ব্যতীত তাঁর পক্ষে পড়াশোনা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ ছিল না। তবে সব জীবনীকারই উল্লেখ করেছেন যে, তিনি পড়াশোনায় যথার্থই ভালো ছিলেন। তাঁর পরীক্ষার ফলই তা প্রমাণ করে। সুযোগ পেলে তিনি যে উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করতে পারতেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। তাঁর মেধার কিছু পরিচয় আমরা পাই বিভিন্ন জীবনীকারদের লেখায়। যেমন, আজহারউদ্দীন খান লিখেছেন—

'পাড়াপড়শিরা (নজরুলকে) রাণীগঞ্জের শিয়ারসোল রাজস্কুলে পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হলেন— মন দিয়ে পড়াশুনা শুরু করলেন। বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে উঠলেন।' নজরুলের বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ও তাঁর 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে' গ্রন্থে নজরুলের মেধার পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'স্কলারশিপ পাবার মত ছেলে নজরুল। প্রতি বৎসর ফার্স্ট হয়ে প্রমোশন পায়।' কিন্তু ওই যে বললাম, নজরুল এক জায়গায় একটানা বেশি দিন থাকতে পারেননি। ফলে শিয়ারসোল রাজস্কুল ছেড়ে তিনি বিভিন্ন জায়গা ঘুরে পুলিশ আধিকারিক রফিজউল্লাহের সহায়তায় দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। সেখানে তিনি 'ফ্রি স্টুডেন্টশিপ' পেয়েছিলেন।' রফিকুল ইসলাম তাঁর 'নজরুল জীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন, '১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে তিনি দেশে ফিরে যান। ঐ পরীক্ষায় নজরুল প্রথম বা দ্বিতীয় হয়ে অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত হয়েছিলেন।' রফিকুল ইসলাম ঢাকা থেকে ১৩৬২-তে প্রকাশিত আবদুল কাদিরের 'কবির জীবন কথা' গ্রন্থ থেকে এই তথ্য পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। পরে নজরুল আবার এই স্কুলেই ভর্তি হলেন অষ্টম শ্রেণীতে, ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। আজহারউদ্দীন খান আবারও লিখেছেন— 'এই স্কুলে তিনি দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিলেন (১৯১৫-১৯১৭)। প্রতি বছর প্রথম হয়ে এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতেন। স্কুলের নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে পুরস্কার পেয়েছিলেন।—রচনা প্রতিযোগিতায় একবার নগদ চার টাকা পুরস্কারও পেয়েছিলেন।' কিন্তু প্রশ্ন হলো, তিনি ষষ্ঠ শ্রেণির পড়াশুনা কোথায় করেন? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় রফিকুল ইসলামের গ্রন্থে। তিনি জানিয়েছেন, '১৯১১ খ্রিস্টাব্দের দিকে প্রথম তিনি (কাজী নজরুল ইসলাম) মাথরুন স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন।' আজহারউদ্দীন খানের গ্রন্থেও অনুরূপ তথ্য মেলে। মেধাবী নজরুলের পক্ষে কথা বলেছেন অরুণকুমার বসুও। তিনি লিখেছেন, 'ডিসেম্বরের পরীক্ষায়

'স্কলারশিপ পাবার মত ছেলে নজরুল। প্রতি বৎসর ফার্স্ট হয়ে প্রমোশন পায়।' কিন্তু ওই যে বললাম, নজরুল এক জায়গায় একটানা বেশি দিন থাকতে পারেননি। ফলে শিয়ারসোল রাজস্কুল ছেড়ে তিনি বিভিন্ন জায়গা ঘুরে পুলিশ আধিকারিক রফিজউল্লাহের সহায়তায় দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। সেখানে তিনি 'ফ্রি স্টুডেন্টশিপ' পেয়েছিলেন। রফিকুল ইসলাম তাঁর 'নজরুল জীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন, '১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে তিনি দেশে ফিরে যান। ঐ পরীক্ষায় নজরুল প্রথম বা দ্বিতীয় হয়ে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছিলেন।'

নজরুল ছিলেন প্রথম স্থানাধিকারী। ফারসিতে তিনি শতকরা আটানব্বই পেয়েছিলেন, অথচ অন্যান্য ছাত্রের নম্বর ছিল পাস নম্বরের নীচে'।

নজরুলের শিক্ষাজীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা দিয়েছেন রফিকুল ইসলাম তাঁর 'নজরুল জীবনী'-তে। তাঁর সংক্ষিপ্ত রূপ—

১.নজরুল বাড়ির পাশের মক্তব থেকে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ দশ বছর বয়সে নিম্ন প্রাথমিক ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

২.১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মাথরুন নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউশনে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন ও 'অনুমিত হয়' ষষ্ঠ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা পাশ করে স্কুল ত্যাগ করেন।

৩.১৯১৪ সালে দরিরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন।

৪.১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান শহরের Albert Victor Institute বা নিউ স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। স্কুলটি কয়েক মাসের মধ্যে উঠে যাওয়ায় তিনি স্কুল ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

৫.১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে শিয়ারসোল রাজ স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে নবম শ্রেণি ও ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে দশম শ্রেণিতে পড়তে পড়তেই সেনাবাহিনীতে যোগ দিলে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার সমাপ্তি ঘটে। এমন সুন্দরভাবে রফিকুল ইসলাম নজরুলের ছাত্রজীবনের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অন্য নজরুল জীবনী গ্রন্থগুলোতে মেলে না। এখানেই এই গ্রন্থের বিশিষ্টতা, যা অন্য জীবনীগ্রন্থগুলোর থেকে গ্রন্থটিকে অনন্যতা দান করে।

সৈনিক জীবন

কাজী নজরুল ইসলামের সৈনিক জীবন তাঁর ভবিষ্যৎকে অনেকাংশে গড়ে দিয়েছিল। সৈনিক জীবনকে তিনি যে শিক্ষা-সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করেছিলেন পরবর্তীকালে তাঁর জীবনে তার অপরিসীম প্রভাব পড়েছিল। তিনজন জীবনীকারই নজরুলের সৈনিক জীবনের প্রসঙ্গে প্রায় একই রকম কথা বলেছেন। কিন্তু ঠিক কোন তারিখে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কেউ কোনো তথ্য দিতে পারেননি। তবে গোল বেধেছে দুই নজরুল জীবনীকার রফিকুল ইসলাম ও অরুণকুমার বসুর বক্তব্যে। রফিকুল ইসলাম তাঁর 'নজরুল জীবনী'-র চৌত্রিশ পৃষ্ঠায় লিখছেন '১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে নজরুল সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। তিনি ঠিক কোন তারিখে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন তা জানা যায় না। তবে বিভিন্ন তথ্য থেকে এটুকু জানা যায় যে শৈলজানন্দের কোয়ার্টালি পরীক্ষার পর এবং নজরুলের প্রি-টেস্ট পরীক্ষার আগে নজরুল সৈনিক হন। তাতে মনে হয় নজরুল ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসের পর সেনাবাহিনীতে যোগ দেন।' আর অরুণকুমার বসু তাঁর 'নজরুল জীবনী'-র কুড়ি পৃষ্ঠায় লিখেছেন, '১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে স্কুলের প্রিটেস্ট পরীক্ষা দিয়েছিলেন নজরুল। তার পরই ছিন্ন-শিকল-পায়ে তাঁর ওড়ার পালা শুরু হল।' রফিকুল ইসলাম যেখানে বলেছেন যে, নজরুল প্রি-টেস্ট পরীক্ষার আগে সৈনিক হন, সেখানে কী করে অরুণকুমার বসু বলেন, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে স্কুলের প্রিটেস্ট পরীক্ষা দিয়েছিলেন নজরুল! আবার ওই গ্রন্থেরই একুশ পৃষ্ঠায় অরুণকুমার বসু লিখলেন, '১৯১৭ সেপ্টেম্বরে নজরুল এক বড়ো বাহিনীর সঙ্গে লাহোর যাত্রা করেন।' স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, যিনি ১৯১৭ সেপ্টেম্বরে সেনাবাহিনীতে যোগদান করে লাহোর যাত্রা করছেন, তিনি কি করে ওই বছরেরই ডিসেম্বরে স্কুলের প্রিটেস্ট পরীক্ষা দিলেন? তাহলে কি অনবধানতাবশত এই মাসের উল্লেখ! নাকি, কাজী নজরুল ইসলাম বলেই যে কোনো মাস বলে দেওয়া যায়! সেখানে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন নেই! নাকি মুদ্রণ প্রমাদ? এতগুলো ভ্রান্তি দূর করার উপায় এই মুহূর্তে আমাদের তাঁদের কাছ থেকে জানার উপায় নেই, কারণ দুজন জীবনীকারই প্রয়াত হয়েছেন।

কলকাতায় প্রত্যাবর্তন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে কলকাতায় ফেরেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর একটি সিদ্ধান্ত শুধু ব্যক্তি নজরুলের নয়, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে। যুদ্ধ ফেরত বাঙালিদের জন্য ব্রিটিশ সরকার যথাসম্ভব চাকরির ব্যবস্থা করে। কাজী নজরুল ইসলামও এই চাকরি গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন। দেখে নেওয়া যাক, বিভিন্ন নজরুল

জীবনীকাররা এ ব্যাপারে কে, কি বলেছেন? আজহারউদ্দীন খান 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' নামের বৃহৎ গ্রন্থেও এই প্রসঙ্গটির অবতারণা করেছেন—'ভেঙ্গে দেওয়া রেজিমেন্ট সৈনিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে সরকারী কাজের জন্য আবেদন করতে বলা হয়। নজরুল অন্ন সংস্থানার্থে সাবরেজিস্টার পদের জন্য দরখাস্ত দিলেন। যথাসময়ে ইন্টারভিউ লেটার এল। কিন্তু তাঁর বন্ধুবান্ধবরা তাঁকে সরকারী চাকরি করতে নিষেধ করলেন। দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্ন ও সংকল্প তখন তাঁরা সকলেই দেখছেন। দেশকে স্বাধীন করার জন্য দিকে দিকে প্রস্তুতি চলছে। এসময় সরকারের গোলামী না করে তরুণদের নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লে কাজ হবে আর তাঁর মত কবি যদি দূর পাড়াগাঁয়ে গিয়ে দলিল রেজিস্ট্রির কাজ করেন তাহলে তাঁর সমস্ত সাহিত্যিক সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাবে' (পৃষ্ঠা-৫৬)। 'নজরুল জীবনী'-কার রফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, 'নজরুল চুরুলিয়া থেকে কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পথে বর্ধমান জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে সাব-রেজিস্ট্রার পদের জন্য দরখাস্ত দিয়ে আসেন। প্রাক্তন সৈনিকেরা তখন এ ধরনের চাকুরি পাবার ব্যাপারে নানা সুবিধা পেত। নজরুল যথারীতি ৩২নং কলেজ স্ট্রিটের ঠিকানায় চাকুরির জন্যে সাক্ষাৎকারের চিঠি পেয়েছিলেন কিন্তু মুজফফর আহমদ, আফজালুল হক প্রমুখ বন্ধুর পরামর্শে নজরুল ইন্টারভিউ দিতে যাননি। সেদিন যে নজরুল তাঁর সৈনিক জীবনের বন্ধু জমাদার শম্ভু রায়ের মতো সরকারি চাকুরিতে ঢুকে পড়েননি সেটা বাংলা সংস্কৃতির পক্ষে সৌভাগ্যই বলতে হবে' (পৃষ্ঠা-৬১)। অরুণকুমার বসু তাঁর গ্রন্থে জানিয়েছেন, 'রেজিমেন্ট-ফেরত সেনাদের চাকরির দাবি ইংরেজ সরকার যথাসম্ভব পূরণ করছিলেন। নজরুলের কাছেও সাবরেজিস্ট্রার পদের ইন্টারভিউপত্র আসে ১৯২১ এই। নজরুল তখন তালতলা লেনে মুজফফর আহমদের সঙ্গেই থাকতেন। শুভানুধ্যায়ী মুজফফর আহমদের পরামর্শে নজরুল ইন্টারভিউ দিতে যাননি। গেলে, নজরুল-জীবন অন্য পথে বাঁক নেওয়ার আশঙ্কা থাকত' (পৃষ্ঠা- ৩২)। এখানে লক্ষণীয়—

অরুণকুমার বসু এবং রফিকুল ইসলামের বয়ানে কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যাচ্ছে। অরুণকুমার বসু পরিষ্কার জানাচ্ছেন যে, কাজী নজরুল ইসলাম তখন মুজফফর আহমদের সঙ্গে তালতলা লেনে থাকতেন। আর রফিকুল ইসলাম বলছেন, নজরুল ইন্টারভিউ-এর চিঠি পেয়েছিলেন ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রিটের ঠিকানায়। যদি নজরুল তালতলা লেনে মুজফফর আহমদের সঙ্গেই থাকবেন তবে কেন তালতলা লেনের ঠিকানা না দিয়ে কলেজ স্ট্রিটের ঠিকানা দিতে গেলেন! এই বিষয়টি নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হলো এই জন্য যে, এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি, আমরা আগেই বলেছি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিলো। আর তার ফলেই আমরা কাজী নজরুল ইসলামের মতো এমন একজন সাহিত্যিককে পেয়েছিলাম।

'ভেঙ্গে দেওয়া রেজিমেন্ট সৈনিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে সরকারী কাজের জন্য আবেদন করতে বলা হয়। নজরুল অন্ন সংস্থানার্থে সাবরেজিস্টার পদের জন্য দরখাস্ত দিলেন। যথাসময়ে ইন্টারভিউ লেটার এল। কিন্তু তাঁর বন্ধুবান্ধবরা তাঁকে সরকারী চাকরি করতে নিষেধ করলেন। দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্ন ও সংকল্প তখন তাঁরা সকলেই দেখছেন। দেশকে স্বাধীন করার জন্য দিকে দিকে প্রস্তুতি চলছে। এসময় সরকারের গোলামী না করে তরুণদের নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লে কাজ হবে আর তাঁর মত কবি যদি দূর পাড়াগাঁয়ে গিয়ে দলিল রেজিস্ট্রির কাজ করেন তাহলে তাঁর সমস্ত সাহিত্যিক সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাবে'

কিছু কথা

যুদ্ধান্তে কলকাতায় ফিরে কাজী নজরুল ইসলাম শুভানুধ্যায়ীদের কথায় সরকারি চাকরি নিলেন না। যদিও

দারিদ্র ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। সৃষ্টি হতে লাগলো তারপর একের পর এক অমর, কালজয়ী রচনা, যা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করলো, ঋদ্ধ হলাম আমরা। কবির হাতে সময় নেই। একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছোটাছুটি। সর্বদা সৃষ্টি এবং অনুষ্ঠান লেগেই আছে। তারপর বিয়ে হলো, সংসার হলো, সন্তান এলো। কারারুদ্ধও হলেন কবিতা লিখে। পুত্র বিয়োগের যন্ত্রনাও সহ্য করতে হলো। তারপর কবি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুস্থতার পর তাঁর শেষ জীবন কীভাবে কেটেছে সেগুলোই তিনজন প্রথিতযশা জীবনীকার কীভাবে দেখেছেন তাঁদের গ্রন্থে, তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে সেকথাই তুলনামূলকভাবে তুলে আনার চেষ্টা করবো।

‘সং পাবলিসিটি অর্গানাইজেশন’ও কাজী নজরুল ইসলাম

প্রথমেই বলে রাখা ভালো রফিকুল ইসলাম তাঁর ‘নজরুল জীবনী’-তে এই প্রসঙ্গের কোন অবতারণাই করেননি। ‘সং পাবলিসিটি অর্গানাইজেশন’-এর সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের বিষয়টি জানা যাচ্ছে আজহারউদ্দীন খানের ‘বাংলা সাহিত্যে নজরুল’ ও অরুণকুমার বসুর ‘নজরুল জীবনী’ থেকে। কিন্তু দু’জনের গ্রন্থে দু’ধরনের তথ্য রয়েছে। একজন তো একটি বিষয়ে উল্লেখই করেননি, অন্যজন সেই বিষয়টি উল্লেখ করতে সাহসী পদক্ষেপ করেছেন।

এবার দেখা যাক দু’জনে কে, কি বলেছেন—

অরুণকুমার বসু লিখেছেন, ‘সেইসময় বাংলায় ফজলুল হকের মন্ত্রিত্বের শাসন চলেছে। সেই মন্ত্রিসভার সুপারিশে সং পাবলিসিটি অর্গানাইজেশন নামে একটি সরকারি প্রচারসংস্থা গঠন করে তাতে একটি সুরকার- -গীতিকার-পরিচালক ও একজন সহায়কের পদ সৃষ্টি করা হয়। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল নজরুল ইসলাম ও আব্বাসউদ্দীন আহমেদকে দুই পদে নিয়োগ করা। কিন্তু নজরুলের এই আকস্মিক স্নায়ুবৈকল্য ও তার বাহ্যিক লক্ষণ তাঁকে ওই পদে নিয়োগের পক্ষে বাধা হয়ে দেখা দিল। একটি স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ এইভাবে বিনষ্ট হল’ (পৃষ্টা- ৪৯৭)। তাঁর বক্তব্য বিশ্লেষণের আগে দেখে নেওয়া যাক, আজহারউদ্দীন খান কি বলেছেন—‘দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বাজারে ভারত সরকার ‘সং পাবলিসিটি অর্গানাইজেশন’ নামে একটি বিভাগ খোলেন। প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন আবু হেনা। এই বিভাগে ‘সং পাবলিসিটি অর্গানাইজার’ ও অতিরিক্ত অর্গানাইজার দুজন নেওয়া হবে। আবু হেনা সাহেব নজরুল ও আব্বাসউদ্দীনের জন্য এ দুটি পদ রেখেছিলেন। - নজরুলের সহকারীরূপে আব্বাসউদ্দীনকে নেওয়া প্রায় ঠিক ছিল কিন্তু প্রচার দপ্তরের তৎকালীন মন্ত্রী পুলিনবিহারী মল্লিকের নিজের স্বজনকে ঐ পদে নিয়োগ করার ইচ্ছে ছিল। নজরুলের অসুস্থতার খবর তাঁর কাছে পৌঁছেছিল। ফলে চাকরী তাঁর হল না’ (পৃষ্ঠা-৩৩৩)।

এক্ষেত্রে আমরা সাদা চোখে বিশ্লেষণ করে দেখছি যে, অরুণকুমার বসু যে ‘সং পাবলিসিটি অর্গানাইজেশন নামে একটি সরকারি প্রচার সংস্থা’ গঠনের কথা বলছেন সেই প্রচার সংস্থা গঠনের সুপারিশ করছে বাংলার ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা। অন্যদিকে আজহারউদ্দীন খান লিখছেন, ‘ভারত সরকার সং পাবলিসিটি অর্গানিজেশন নামে একটি বিভাগ খোলেন।’ যেকোনো নজরুল-প্রেমী তো বটেই, গবেষক হলে তো কথাই নেই, জানতে চাইবেনই তাহলে কোন সরকারের সুপারিশে সং পাবলিসিটি অর্গানাইজেশন তৈরি হলো? বাংলার মন্ত্রিসভা না ভারত সরকার? নজরুলের ওই চাকরিটি হয়নি। তার একমাত্র কারণ কি তাঁর অসুস্থতা, যেটি অরুণকুমার বসু লিখেছেন, নাকি অসুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে হক মন্ত্রিসভার প্রচার দপ্তরের তৎকালীন মন্ত্রি পুলিনবিহারী মল্লিকের নিজের স্বজনকে ওই পদে নিয়োগ করার ইচ্ছা! কোন কারণে নজরুলের ওই চাকরি হয়নি, তাও স্পষ্ট হয় না!!

নজরুলের অসুস্থতা ও বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ

কাজী নজরুল ইসলামের অসুস্থতা, বধিরতা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি অপার বিস্ময়। তাঁর ১৯৪২ থেকে আমৃত্যু ১৯৭৬, এই দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর কোন কিছু বলতে, লিখতে না পারা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর অসুস্থতার খবর বাংলার সাহিত্যপ্রেমী সমাজ, রাজনৈতিক অঙ্গনে কী রকম প্রভাব ফেলেছিল, কারা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন, কারা তাঁকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন সে সম্পর্কেও সঠিক তথ্যের অভাব রয়েছে বিভিন্ন জীবনীকারদের রচনায়। তবে সঠিক সময়ে, সঠিক ব্যক্তিদের কাছ থেকে যে তিনি সহায়তা পাননি, সে ব্যাপারে সব জীবনীকারই একমত এবং

পরবর্তীকালে চিকিৎসকরা যে জানিয়েছেন যে তাঁর চিকিৎসায় বিলম্ব হয়েছিল, চিকিৎসা যথাসময়ে শুরু হলে হয়তো তাঁর জীবনে এই অকালসন্ধ্যা নেমে আসত না, সে ব্যাপারে সবাই সহমত পোষণ করেছেন। তবে যেভাবে একেবারে চাঁচাছোলা ভাষায় আজহারউদ্দীন খান নজরুলের প্রতি যাঁরা অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছিলেন তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন তেমনভাবে অন্য কেউ বলতে পারেননি। যেমন, ফজলুল হক। তিনি বাংলার প্রধানমন্ত্রী হয়েও যাঁর কাছে একদা 'নবযুগ'-এ চাকরি করার সূত্রে নজরুলের কিছু পাওনা ছিল তিনিও 'আর্থিক সাহায্য ত দূরের কথা অনাবশ্যকভাবে কিছু উপদেশ ছুঁড়ে মারলেন।' একথা বলেছেন আজহারউদ্দীন খান। তিনি আরও জানিয়েছেন, 'মুসলমান সমাজের সম্মানীয় ব্যক্তি যেমন তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রী তামিজউদ্দীন খান (১৮৮৯-১৯৬৩), খাজা নাজিমউদ্দীন (১৮৯৪-১৯৬৪), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি (১৮৯৩-১৯৬৩), মাওলানা আকরম খাঁ প্রমুখ কেউ কিছু করলেন না, পাত্তাই দিলেন না' (পৃষ্ঠা-৩৩৫)। বেশকিছু বেসরকারি নজরুল নিরাময় সমিতি সেই সময় গঠিত হয়েছিল। তবে সেক্ষেত্রে সব সমিতি থেকে নজরুল সহায়তা পাননি, এমনকি যারা অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন সেই অর্থ সর্বদা তাঁর কাছে পৌঁছায়নি বলে জানা যায়। তবে সব জীবনীকারই স্বীকার করেছেন, হক মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী নজরুলের পাশে দাঁড়ান। তিনি সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতিই শুধু দেননি, বায়ু পরিবর্তনের জন্য মধুপুরে থাকার ব্যবস্থাও করেন।

নজরুল ও স্বাধীন বাংলাদেশ

বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশ যা একদা অখণ্ড, পরাধীন ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত ছিল সেখানে নজরুল বহুবার গিয়েছিলেন। সেখানকার মানুষের সঙ্গে ছিল তাঁর আত্মিক যোগ। বিশেষ করে ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ইত্যাদি জায়গাগুলিতে। ছাত্রাবস্থায় তিনি পড়তে গিয়েছিলেন ময়মনসিংহে। সেখানে এখনও তার স্মৃতিধন্য স্কুলটি রয়েছে। যে কাজীরসিমলা গ্রামে তিনি থাকতেন সেখান থেকে স্কুলে যাওয়া আসার পথে বিশ্রাম নেওয়ার সময় তিনি যে গাছের ছায়ায় বসে বাঁশি বাজাতেন, তারও চিহ্ন রয়েছে। তাঁর দেশপ্রেমমূলক বিভিন্ন গান ও কবিতা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করেছিল। ফলে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ১৯৭২ সালে সেখানকার বহু বুদ্ধিজীবী মানুষের পরামর্শ ও অনুরোধে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের অনুরোধে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন যাতে বাংলাদেশ সে বছর কবিকে সামনে রেখে নজরুল-জয়ন্তী পালন করতে পারে।

কাজী নজরুল ইসলামের এমনই দুর্ভাগ্য যে, যখন তিনি মুক, বধির; কোন কিছুই তিনি অনুধাবন করার মতো অবস্থায় নেই তখনও তাঁকে নিয়ে নানা রকম বিভ্রান্তি জীবনীকাররা তৈরি করেছেন। আশ্চর্য হতে হয় এমন একটি বিষয়ও তাঁরা একমত হতে পারলেন না! উপরন্তু পাঠককে বিভ্রান্তির সামনে ফেলে দিলেন। একে শুধু মুদ্রণ প্রমাদ বলে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। দেখা যাক এই প্রসঙ্গে কে, কি বলেছেন—

অরুণকুমার বসু:

১. ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু তাই প্রস্তাব করলেন ১৯৭২-এর কবিজন্মদিনটি তাঁরা কবিকে সামনে রেখে বাংলাদেশেই

কাজী নজরুল ইসলামের এমনই দুর্ভাগ্য যে, যখন তিনি মুক, বধির; কোন কিছুই তিনি অনুধাবন করার মতো অবস্থায় নেই তখনও তাঁকে নিয়ে নানা রকম বিভ্রান্তি জীবনীকাররা তৈরি করেছেন। আশ্চর্য হতে হয় এমন একটি বিষয়ও তাঁরা একমত হতে পারলেন না! উপরন্তু পাঠককে বিভ্রান্তির সামনে ফেলে দিলেন। একে শুধু মুদ্রণ প্রমাদ বলে এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

উদ্‌যাপন করতে চান। পরের বৎসর আবার কবিকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গ পালন করবে নজরুল জন্মজয়ন্তী।'

২. '১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সরকার একুশে ফেব্রুয়ারি তাদের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান একুশে পদক কবিকে প্রদান করেন এবং ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে নজরুলকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়।'

রফিকুল ইসলাম:

১. 'স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুরোধে ভারত সরকার বিদ্রোহী কবিকে বাংলাদেশে যাবার অনুমতি প্রদান করেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ২৪শে মে বাংলাদেশ বিমানে করে কবিকে সপরিবারে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়।'

২. '১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে নজরুলকে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান এবং ২১শে ফেব্রুয়ারিতে 'একুশে পদকে' ভূষিত করেন।'

আজহারউদ্দীন খান:

১. '১৯৭১, ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে বুদ্ধিজীবী মহল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের (১৯২০-১৯৭৫) কাছে নজরুলকে বাংলাদেশে আনার জন্য দাবি জানান। শেখ সাহেবের অনুরোধে ভারত সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নজরুলকে বাংলাদেশে নিয়ে যাবার অনুমতি দেন। ১৯৭২ সালের ২৪শে মে (১৩৭৯, ১০ই জ্যৈষ্ঠ) বুধবার ভারতীয় নাগরিক হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফকার ফ্রেন্ডশীপের বিশেষ ফ্লাইট বাংলাদেশ সময় বেলা ১১টা ৪০মিনিটে তেজগাঁ বিমানবন্দরে অবতরণ করে।'

২. '১৯৭৬, ১৮ই ফেব্রুয়ারি, (১৩৮২, ৫ই ফাল্গুন) বুধবার কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। আর ঐ বছরের একুশে ফেব্রুয়ারিতে 'একুশে পদক' প্রদান করা হয়—এটিই কবি-জীবনের শেষ অনুষ্ঠান।'

তিন জনের কারও বক্তব্যের প্রতি পক্ষপাত না করে সাধারণভাবে আমাদের কয়েকটি জিজ্ঞাসা—

এক. কবিকে যখন স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয় তখন কি সেই প্রস্তাবের শর্ত হিসেবে পরের বছর কবিকে আবার বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফেরত পাঠাতে হবে এই মর্মে কোন চুক্তি হয়েছিল? কারণ বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক আছে। বিতর্ক এই কারণে যে, কবিকে বাংলাদেশ সরকার আর ভারতে ফেরত পাঠাননি। এমনকি তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রের ঢাকা যাওয়ার জন্য অপেক্ষা না করেই তাঁকে কবরস্থ করা হয়।

দুই. কবিকে কত সালের কত তারিখে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ও একুশ পদক দেওয়া হয়? কেননা এ ব্যাপারেও তিনজনের বক্তব্যে সাযুজ্য নেই।

অরুণকুমার বসু যেমন বলেছেন, কবির জন্মদিন পালনের পর তাঁকে ভারতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে বলা হয়েছিল, কিন্তু বাংলাদেশ সরকার সেটি করেনি বা ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকেও সেই ভাবে কবিকে দেশে ফেরত পাঠানো বা আনার ব্যাপারে কেউ কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। এবার নাগরিকত্ব প্রসঙ্গ। অরুণকুমার বসু বলেছেন, কবিকে ১৯৭৫ সালে জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। আর আজহারউদ্দীন খান বলছেন, ১৯৭৬ এর ১৮ই ফেব্রুয়ারি বুধবার কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। অন্যদিকে রফিকুল ইসলাম বলেছেন, ১৯৭৬-এর জানুয়ারি মাসে নজরুলকে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেন। হায় কবি! এই পার্থক্য বা অনবধানতা বা ঔদাসীন্য সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। জীবনীকারদের এই বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত ছিল বলে মনে করি।

কথা শেষ

তবে তিনটি গ্রন্থেরই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে নজরুল-জীবনী অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে। তিনজন ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কাজী নজরুল ইসলামের জীবনের বহু অজানা দিক আমাদের সামনে নতুন করে উন্মোচন করে আমাদের আগ্রহকে উজ্জীবিত করেছেন। এজন্য অবশ্যই তাঁরা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবে ছিন্ন ছিন্ন নজরুলকে এক সূত্রে গেঁথে সম্পূর্ণ নজরুলকে উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে নানা রকম বাধা থাকলেও তাঁর সম্পর্কে শেষ কথা বলার সময় এখনও হয়নি। একমাত্র সময়ই পারে শেষ কথা বলতে। সেই সময়ের অপেক্ষায় আমরা রইলাম। নতুন কোনো গবেষকের কাছ থেকে সম্পূর্ণ নজরুলকে পাওয়ার প্রত্যাশায়।

উপন্যাস

সেখ রফিকুল ইসলাম

ঘূর্ণাবর্ত

(বিশ শতকের সাত-আটের দশক। এরাজ্যের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসে এক ক্রান্তিকাল। নকশাল আন্দোলনের ভয়াবহতা, জাতীয় কংগ্রেসের পশ্চাৎপদতা, রাজতখতে বামপন্থীদের প্রতিষ্ঠা; এসব কিছুর সমন্বিত অভিঘাতে আলোড়িত হয়েছিল আমাদের ব্যক্তিক, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন। সেদিনের সেই আলোড়িত জীবনের অসামান্য শৈল্পিক নির্মাণ এই উপন্যাস)

১৩ তম অধ্যায়:– ও পথে চলায় প্রথম হোঁচট।

সামাজিক রীতি- প্রথা মেনে ঠাকুমার পরলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করতে আরও এক সপ্তাহ বাড়ীতেই থেকে যেতে হল।

গ্রামের একজন ফাইনাল পরীক্ষার্থীর মুখে শুনলাম গতকাল আমার রেজাল্ট বের হয়েছে এবং স্কুল থেকে যথারীতি মার্কসিট দেওয়া হচ্ছে। এ খবর শুনে আমাকে হোস্টেলে ফেরার উদ্যোগ নিতে হল। তার পরের দিন দুপুরে খেয়ে দেয়ে হোস্টেলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। বাজারে বাসস্টান্ডে নেমে দেখলাম বাজারের দোকান পাট বন্ধ, লোক জন নেই, কেমন যেন শুনশান, থমথমে ভাব। যদিও সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু এ সময় তো বাজার বন্ধ হওয়ার কথা নয়—ব্যাপারটা কী? বাজার থেকে হোস্টেলের ঐ পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ; অন্ধকারের মধ্যেই হোস্টেলে ফিরে এলাম। আমার রুমের দরজায় শেকল লাগানো আছে। রুমমেট সঞ্জয় দেবাশীষের থাকার কথা। কিন্তু তারা কেউ নেই। বিস্ময় আরও বাড়ছে। এ সময় হোস্টেলে অন্যান্য শ্রেণীর ছাত্ররা কেউ থাকে না। কারণ তাদের ক্লাস এখনো শুরু হয়নি। কেবলমাত্র আমরা যারা ফাইনাল পরীক্ষার্থী ছিলাম তাদেরই কয়েক জন থাকার কথা। আমাদের হোস্টেলের রাধুনী আশুদা (আশুতোষ সরকার) তারও দেখা নেই, উনোন জ্বলছে না। একটা খাঁ খাঁ শূন্যতা আমাকে চেপে ধরেছে। একটু আশার আলো দেখা গেল নীচের তলায় তরুন স্যারের ঘরে আলো জ্বলছে।

গুটি গুটি পায়ে স্যারের কাছে গেলাম। দেখলাম স্যার একটি স্টোভে ভাত চাপিয়েছেন। আমাকে দেখে স্যার এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন কিরে তুই কি করে এলি, তোকে কেউ দেখেনি তো?

আমি—না কারোর সাথে দেখা হয়নি। তা ছাড়া দোকানপাট তো সব বন্ধ দেখলাম।

তরুন বাবু – বোস, হাঁড়িতে আর এক মুটো চাল ফেলে দিই।

তরুন বাবু – হ্যাঁ আজকে বিরোধী পক্ষ বন্ধ ডেকেচে। পুলিশ প্রশাসন একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করেছে। মাঝে মধ্যেই পুলিশের জিপ টহল দিয়ে যাচ্ছে।

আমি– স্যার- ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না। কী এমন ঘটনা ঘটলো যে বনধ, একশো চুয়াল্লিশ ধারা, পুলিশী টহল হচ্ছে ঐ? তা ছাড়া দেবাশীষ ও সঞ্জয় গেল কোথায়?

তরুন বাবু– সব বলছি- আগে রান্নাটা হয়ে যাক। তাড়াতাড়ি দুটি খেয়ে দেয়ে নে। তোকে হোস্টেলে রাখাটাও বোধ হয় নিরাপদ হবে না। দেখি কোথায় তোকে আজকের রাতটার মত থাকবার ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। মিনিট পনেরোর মধ্যেই ঘুরে আসছি। ভাতটা হয়ে গেলে স্টোভটা নিভিয়ে দিস। আর স্কুলের ছাদের উপর গিয়ে বসে থাকবি। হোস্টেল সংলগ্ন পূর্বদিকে স্কুল। হোস্টেলের ছাত্রদের সরাসরি স্কুলে যাবার জন্য একটা প্যাসেজ আছে। যেখানে গেট নেই। আমি ঐ প্যাসেজ ধরেই স্কুলের ছাদে গিয়ে বসলাম। একটু পরেই স্যার ফিরে এলেন। চল এবার দুটি খেয়ে নিবি চল। এই বলে স্যারের রুমে বসেই দুজনে আলু ভাতে ডাল সেদ্ধ দিয়ে ভাত খেয়ে নিলাম।

তরুন বাবু– চল্ যেতে যেতে কথা হবে। মূল রাস্তা ছেড়ে আল পথে হাঁটতে হাঁটতে বেশ কিছুদূর আসার পর- ফাঁকা মাঠে বসেই- তরুন বাবু ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দিতে লাগলেন।

তিনদিন আগে নির্বাচনী প্রচারের জন্য কলেজ হোস্টেলের দেওয়ালে ছাত্র পরিষদের একজন ছাত্র রাত্রিবেলায় দেওয়াল লিখন করছিল। কে- বা কারা যেন ঐ ছাত্রটীকে খুন করে। অন্তত দশ বারো জায়গায় ছুরির আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। এই নৃশংস খুনের প্রতিবাদের ঐ দলের নেতারা- ঐ মৃতদেহ নিয়ে এলাকায় মিছিল করে এবং কলেজ হোস্টেলের ছেলেরাও এতে সামিল হয়। একই সঙ্গে চক্রান্ত করে আমাদের বেশ কিছু লোকেদের নামেও থানায় ডাইরি করে। সেখানে দেবাশীষ এবং সঞ্জয়ের নামও জড়িয়ে দেওয়া হয়।

গতকাল স্কুল খুললে মার্কশীট ও ক্যারেকটার সার্টিফিকেট নিয়ে দেবাশীষ ও সঞ্জয়রা হোস্টেলে ফিরে এল; তখনও টের পাওয়া যায়নি ওদের নাম এই মার্ডারের সাথে জড়িয়ে গেছে। বিকালে ওরা যখন বাজারে চা খেতে গিয়েছিল ঠিক তখন কলেজ হোস্টেলের ছাত্র পরিষদের কিছু ছাত্র ওদেরকে ঘিরে ধরে এবং কিল, চড়, ঘুসি, এলোপাথাড়ি ভাবে মারতে থাকে। থানাতে কোনও ভাবে খবর গেলে বড়বাবু পুলিশ নিয়ে এসে কোন রকমে ওদের দুজনকে থানায় নিয়ে গিয়ে পুলিশ হেফাজতে রাখে।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তখুনি থানায় গিয়ে দেখি ওদের জামা ছিঁড়ে গেছে। মুখ কোথাও ফুলে গেছে এবং বিষণ্ণ মনে থানার লক আপের মধ্যে বসে আছে।

থানার বড়বাবু আমাকে দেখেই বললেন—দেখুন আপনার গুণধর ছাত্রদের অবস্থা—এইটুকু বয়স থেকে রাজনীতিতে না নামলে চলতো না। এবার ঠ্যালা সামলান—কী করে বাঁচাবেন-বাঁচান। উপরতলার চাপ আছে, এদের নামে চার্জশীট দিতে হবে; আর কালকেই কোর্টে পাঠাতে হবে।

বড়বাবুকে বললাম—দেখুন ওরা রাজনীতিতে কতটা জড়িয়েছে বা রাজনৈতিক কার্য্যকলাপে কতটা অংশগ্রহণ করেছে- সেটা বোধহয় আমার থেকে কেউ বেশী জানে না। তবে এটুকু বলতে পারি—এই হত্যার ঘটনার সাথে ওরা কোনভাবেই জড়িত নয়। তাছাড়া হোস্টেল সুপার হিসাবে রাত্রির খাওয়া দাওয়া সেরে হোস্টেলের ছাত্ররা সব রুমে আছে কিনা, এটা দেখা আমার প্রতিদিনের ডিউটি এবং প্রতিদিনই এই ডিউটি সেরে হোস্টেলের গেটের তালা বন্ধ করে আমি শুতে যাই। ঐ দিনও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। আপনি জানেন যে এই সময় হোস্টেলে অন্যান্য শ্রেণীর ছাত্ররা এখনও আসেনি। কেবলমাত্র ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়া ছাত্ররাই মার্কশীট নেবার জন্য হোস্টেলে এসেছিল। যাদের মধ্যে বেশীর ভাগ ছাত্রই মার্কশীট নিয়ে বাড়ী ফিরে গেছে।

আরে মশাই স্কুল কলেজের সেরা ছাত্ররাই তো এখন নকশাল আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে। তারাই তো বিপ্লব করবে বলে খুন-খারাবি করে বেড়াচ্ছে—আর প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। যদিও আমাদের এলাকায় এই দলের দৌরাত্ম কম তবুও কোথাও কোথাও ‘চিনের চেয়ারম্যান-আমাদের চেয়ারম্যান’, নকশাল বাড়ী জিন্দাবাদ এসব পোস্টারও দেখা যাচ্ছে। একই সঙ্গে কয়েকজন জোতদারদের বাড়ীতে ডাকাতি ও বন্দুক লুটের ঘটনা ঘটেছে। সুতরাং আমাদের এলাকায় যে এদের কোন গোপন সংগঠন নেই বলা যাবে না।

কেবলমাত্র এরাই এখানে ছিল মার্কশীট নিয়ে বাড়ী ফিরতে পারবে না বলে। তাছাড়া রাত বারোটা পর্যন্ত ওদের সঙ্গে পড়াশুনার প্রশ্নে কে কোথায় কি নিয়ে পড়বে এই সব আলোচনা, গল্প করে কাটিয়েছি। কারণ এদের সাথে আর দেখা হবে কিনা জানা নেই। এরা স্কুলের মেধাবী ছাত্র—বলা যেতে পারে, আমারও প্রিয় ছাত্র।

বড় বাবু–আরে মশাই স্কুল কলেজের সেরা ছাত্ররাই তো এখন নকশাল আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে। তারাই তো বিপ্লব করবে বলে খুন-খারাবি করে বেড়াচ্ছে—আর প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। যদিও আমাদের এলাকায় এই দলের দৌরাত্ম কম তবুও কোথাও কোথাও ‘চিনের চেয়ারম্যান-আমাদের চেয়ারম্যান’, নকশাল বাড়ী জিন্দাবাদ এসব পোস্টারও দেখা যাচ্ছে। একই সঙ্গে কয়েকজন জোতদারদের বাড়ীতে ডাকাতি ও বন্দুক লুটের ঘটনা ঘটেছে। সুতরাং আমাদের এলাকায় যে এদের কোন গোপন সংগঠন নেই বলা যাবে না। আ ই বি (ইনটেলিজেন্সী বুরো)

সূত্রে খবর নিশ্চয়ই পেয়ে যাবো। হয়তো এই মার্ডার কেসটা ওরাও ঘটাতে পারে।

তরুন বাবু—যাই হোক এই ছেলেদুটির ব্যাপারে- কী চিন্তা ভাবনা করেছন। আপনার কাছে অনুরোধ, এদের ভবিষ্যত নষ্ট হয় এমন কাজ করবেন না।

বড়বাবু—দেখুন তরুনবাবু, আমি বিশ্বাস করি এরা এ ঘটনার সাথে যুক্ত নয়। এদের বিরুদ্ধে এই কেসের চাজর্শীটে নাম ঢোকালে এদের ভবিষ্যত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু স্থানীয় ভাবে রাজনৈতিক চাপ ও উপর তলার প্রশাসনিক চাপ আছে। ফলে আমাদেরও হাত পা বাঁধা। নিরপেক্ষতা বজায় রাখা খুবই মুস্কিল। তবে এরা তো এখনও নাবালক, সেক্ষেত্রে কিছুটা হলেও আইনি ছাড় মিলতে পারে। দেখি উপর তলায় যোগাযোগ করে— ওরা কী বলে। এই বলে জেলার এস. পি সাহেব কে ডায়াল করলেন। বেশ কিছুক্ষণ কথা- বার্তার পর আমাকে বললেন—তরুনবাবু, আজ রাত্রির মধ্যে ওদের গার্জেনকে থানায় এনে হাজির করুন এবং মুচলেখা দিয়ে নিয়ে যাক—এটুকুপর্যন্ত করতে পারি। তবে আজ রাত্রির মধ্যে না এলে কালকেই আমাকে কোর্টে পাঠাতে হবে। বড়বাবুর মুখে একথা শুনে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। থানা থেকে বেরিয়ে দেবাশীষ ও সঞ্জয়ের বাবাকে কীভাবে খবর দেওয়া যায়, কেই বা ওদের বাড়ী চেনে—এই ভাবতে ভাবতে হোস্টেলে ফিরলাম। হঠাৎ রতন, কনকের কথা মনে পড়ে গেল। ফাইনাল পরীক্ষার পর তোরা একে অপরের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলি। সঙ্গে সঙ্গেই রতন ও কনকদের বাড়ীতে গেলাম। মোস্তফা সাহেব ও অমলবাবুকে সমস্ত কথা এবং থানার বড়বাবুর সাথে আলোচনার আনুপূর্বিক বিবরণ শোনালাম। দেবাশীষ এবং সঞ্জয়ের বাবা হোস্টেলে এলেন। ঘটনার সমস্ত বিবরণ শুনে স্তম্ভিত এবং ঘটনার দায়ভার, আমার উপর চাপিয়ে দিতে ছাড়লেন না। আমি ও অবস্থায় নীরবে তা হজম করে গেলাম। এ ছাড়া আর করবোটাই বা কি?

যাইহোক ওনাদেরকে নিয়ে থানায় এলাম। ছেলেটিকে ঐ অবস্থায় থানা লক আপে দেখে দেবাশীষের বাবা চিৎকার করে উঠলেন তোকে—এই জন্য এখানে পাঠিয়েছি।

বড়বাবু— শাসনটা বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে করবেন। মুচলেকা দিয়ে ছেলেকে বাড়ী নিয়ে যান। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরণের কাজ না করে, সে দিকে নজর দেবেন।

তরুনবাবু আবার শুরু করলেন— থানা থেকে ফিরে এসে বই বাক্স, প্যাঁটরা বেডিংপত্র বাঁধা- ছ্যাঁদা করে ওদের দুজনকে নিয়ে ওদের বাবারা রাত্রির মধ্যেই হোস্টেল ছেড়ে গেলেন। ওঁরা ট্যাক্সি ভাড়া করেই এসেছিলেন, সুতরাং ফিরে যাওয়ার কোন অসুবিধা ছিল না।

যাবার সময় ওদের বাবারা তো বটেই দেবাশীষ- সঞ্জয় পর্যন্ত কোন কথা না বলেই চলে গেল। এ যন্ত্রণাটা ভীষণ ভাবে বুকে বাজছে। হয়তো ওদের বাবাদের ভয়ে আমার সাথে শেষ দেখাটাও করে যেতে পারেনি। এবার ওঠ। তোকে আজকের রাতটা থাকার জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে আসি। এই বলে কিছুদূরে মাঠের ধারে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসে হাজির হলাম। আমাদিকে দেখেই ভদ্রলোক বাড়ীর মধ্যে নিয়ে এসে সদর দরজা বন্ধ করে দিলেন। একপাশের এক রুমে দেখলাম বিছানা মশারী ঠিক করাই আছে। তরুন বাবুই বললেন— আমরা খাওয়া সেরেই এসেছি। আপনাকে আর ব্যস্ত হতে হবে না।

ওনাদের সাথে কথা বার্তায় যে টুকু জানা গেল, এক ছেলে ভিনরাজ্যে কোন এক কোলিয়ারিতে সবেমাত্র চাকরীতে ঢুকেছে। ঘরদোর দেখে মোটামুটি আর্থিকভাবে সম্পন্ন বলা যায়। দীর্ঘদিনের বামপন্থী সমর্থক। সেই বিশ্বাসেই তরুনবাবু এখানে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। তরুন বাবু যাবার সময় বলে গেলেন—খবর না দেওয়া পর্যন্ত বাড়ীর বাইরে বের হবি না। দেখা যাক কালকের পরিস্থিতি কেমন থাকে। হেডমাস্টার মশাইকে বলে রাখবো—কোন এক সময়ে গিয়ে মার্কশীট নিয়ে আসবি, নয়তো পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পরে আর একবার এসে নিয়ে যাবি।

১৪তম অধ্যায়— কৈশোরের বিদায় লগ্নে

কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। একটা ভিন্ন পরিবেশ, উদ্বিগ্নতা নিয়ে বিছানায় এপাশ ও পাশ করেছি। সকালে উঠে যথারীতি মুখ হাত ধুয়ে চা জলখাবার খেয়ে বাড়ীর মালিক কে বললাম—কাকাবাবু রাস্তা ঘাট, বাজারের পরিস্থিতি কি রকম, একটু খোঁজ নিলে হত না। আমার মনের অবস্থা বুঝে উনি বললেন—হ্যাঁ একটু পরে কিছু খেয়ে বেরুবো। দরকার হলে তরুনবাবুর সাথে দেখা করেও আসবো। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো—আশা করি ভালোভাবেই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। দুপুরে খেতে বসেছি এমন সময় কাকাবাবু ফিরে এসে বললেন— এলাকায় এখনো টহল চলছে। তবে বাজারের দোকানপাট খুলেছে, পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক। তেমন কোনো উত্তেজনা চোখে পড়লো না। তরুনবাবুর সাথে দেখা করলাম। উনি বললেন—তুমি মাঠে মাঠে গিয়ে হোস্টেলে ঢুকবে এবং বিকাল ৪টা নাগাদ হোস্টেল থেকেই স্কুলে এসে

রেজাল্ট নেবে। সেইমত হেডস্যারের সাথে কথা বলে রেখেছেন।

দুপুরে স্নান খাওয়া সেরে একটু বিছানায় গড়িয়ে নিয়ে মাঠের আল পথ ধরে হোস্টেলে ফিরে এলাম। তরুনবাবুর নির্দেশ মত বিকাল পৌনে চারটেয় স্কুলে প্রবেশ করলাম। হেডস্যারের অফিসে কয়েকজন শিক্ষক ও অফিস বেয়ারা আছেন। তাছাড়া গোটা স্কুল ফাঁকা— কোন ছাত্র-ছাত্রী নজরে পড়লো না। অফিস রুম থেকে মার্কশীট নিয়ে স্যারেদের প্রণাম করে হোস্টেলে ফিরে এলাম। ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী থাকার সময় বইপত্র মুড়ির টিন, হ্যারিকেন অন্যান্য জিনিস পত্র আগেই নিয়ে গিয়েছিলাম। পড়েছিল কেবলমাত্র বিছানাটা। সেটাকেও গুছিয়ে নিয়ে ছোট করে বেঁধে নিলাম—আরও একবার স্কুলের চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখছি—স্কুলের সামনের প্রাঙ্গণে গোল করে লাল দুরন্ত গাছের পাতায় ঘেরা ডিম্বাকৃতি প্রার্থনা স্থল, চারদিকে পাতাবাহারী গাছের বেড়া, মধ্যস্থলে ছোট বৃত্তের মধ্যে টবে রাখা মরশুমি ফুল। স্কুল ছুটি হলে ঐ জায়গাটি আমাদের খুবই পছন্দের স্থল। ওখানে বসে কত আড্ডা দিয়েছি। ঐ আমাদের ক্লাস রুম, ঐখানে আমাদের প্রাকটিকাল রুম যেদিকে চোখ যায় সেখানেই কোন না কোনও ছবি চোখেতে ভেসে উঠছে। না আর মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই, গুটি গুটি পায়ে রুমে ফিরে এলাম। বেডিং নিয়ে নীচে নেমে তরুনস্যারের সাথে দেখা করতে গেলাম। স্যারকে প্রণাম করে বললাম —আসছি স্যার। তরুনবাবু আমার মাথায় হাত রেখে মুখের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন—হ্যাঁ যেতে তো হবেই। হয়তো আমাকেও এখান থেকে চলে যেতে হবে। কাল ম্যানেজিং কমিটির মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে— সুপারিনটেন্ডে র পদ তো ছাড়তে হবেই, আগামী পনের দিন সময় দিয়েছে অন্য কোথাও যেন বাসা খুঁজে নিই।

একটু দাঁড়া—এই বলে স্যার ঘরের ভিতরে গিয়ে পৃথক খাপে ভরা তিনটি পেন নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন—তোদের তিনজনের জন্য এই তিনটে পেন কিনেছিলাম। সঞ্জয়—দেবাশীষের সাথে যাবার সময় তো ঠিকমত কথাও হল না, চলে গেল। ঐ পরিস্থিতিতে আমারও খেয়াল ছিল না। তোর সাথে দেখা হলে এ দুটো পেন ওদেরকে দিয়ে দিস। আর এটা তোর জন্য।

একটু অপেক্ষা করে যা—আর একটু সন্ধ্যা হোক তারপর যাবি। লাস্ট টিপ তো সেই সন্ধ্যা ৭টায়। নব মালিকে বলে দিচ্ছি বেডিংপত্রগুলো বাসস্টান্ডে নিয়ে গিয়ে ওখানে অপেক্ষা করবে। তুই বরং একটু ঘুম আঁধার হলে একা-একাই যাবি। স্কুলের মালী নবাদা—একটু আগেই বাসসান্ডে আমার বেডিং নিয়ে গেছে। আমিও সন্ধ্যার আঁধার একটু ঘনিয়ে এলে বাসসান্ডে এসে পৌঁছলাম। নবাদার হাতে দশটাকা গুঁজে দিয়ে বললাম— যাও হোস্টেলে ফিরে যাও। বাস আসতে তখনও মিনিট কুড়ি দেরি আছে।

বাসস্টান্ডের কাছেই বাবলাগাছের তলায় বসে আছি বাসের অপেক্ষায়। রাস্তার উল্টোদিকে সুজিতদার বইয়ের দোকান, গোপীদার মিষ্টির দোকান,গফফারচাচার সব্জীর দোকান, চক্রবর্ত্তীদের কাপড়ের দোকান, সুনীলদার সেলুন। সারিদিয়ে সব দোকান। এদের সাথে আমাদের নিত্য দিনের পরিচয়। একবার ভাবলাম ওদের সাথে যাবার সময় একটু দেখা করে আসি। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করলাম না, গতকাল থেকে লুকোচুরি খেলেই তো আঁধারের মোড়কে গা ঢাকা দিয়ে আজ চলে যেতে হচ্ছে। আর ঝুঁকি নেওয়ার দরকার নেই।

আজ এই আঁধারও আমাকে নিরাপত্তা দিচ্ছে। আজ বাজারে লোকজন নেই বললেই চলে, হয়তো তারা সন্ধ্যানামার আগেই ফিরে গেছে। হঠাৎ দেখি— সুজিতদার বইয়ের দোকান থেকে কনক, রতন, মৌসুমীরা বের হচ্ছে। মৌসুমীর হাতে একটা কাগজে মোড়া প্যাকেট—হয়তো ঐ প্যাকেটে বই- খাতা কিছু থাকবে।

সুজিতদার বইয়ের দোকান থেকে কনক, রতন, মৌসুমীরা বের হচ্ছে। মৌসুমীর হাতে একটা কাগজে মোড়া প্যাকেট—হয়তো ঐ প্যাকেটে বই- খাতা কিছু থাকবে। নুতন ক্লাসের জন্য বই-খাতা কিনতে এসেছে। ওদের দেখে মনটা একটু চনমন হয়ে উঠলো। যাইহোক- দেবশীষ, সঞ্জয়ের সাথে দেখা না হওয়ার বেদনা অনেকটা লাঘব হল এদের দেখে। রাস্তার ওপারে কাছাকাছি আসতেই ডাক দিলাম কনক—এই রতন। ওরা হয়তো নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। এই সময়, আমি এখানে থাকতে পারি। ওরা দ্রুতপায়ে আমার কাছে এসে হাজির হল।

নুতন ক্লাসের জন্য বই- খাতা কিনতে এসেছে। ওদের দেখে মনটা একটু চনমন হয়ে উঠলো। যাইহোক- দেবাশীষ, সঞ্জয়ের সাথে দেখা না হওয়ার বেদনা অনেকটা লাঘব হল এদের দেখে। রাস্তার ওপারে কাছাকাছি আসতেই ডাক দিলাম কনক—এই রতন। ওরা হয়তো নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। এই সময়, আমি এখানে থাকতে পারি। ওরা দ্রুতপায়ে আমার কাছে এসে হাজির হল।

কনক—তুই কবে—কখন এলি? আর এই সময়ই বা চলে যাচ্ছিস কেন?

রতন—রেজাল্ট বেরোনোর আগের দিন থেকে তোকে খুঁজছি, হোস্টেলেও গিয়েছি। তরুন স্যারের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম তুই বাড়ী থেকে ফিরিসনি। দেবাশীষ, সঞ্জয়ের ব্যাপারটা খুবই প্যাথেটিক। ওদের সাথেও যাবার সময় দেখা হল না—খুবই মন খারাপ লাগছে রে।

মৌসুমী— মা বলেছিল- তোমাদের সবাইকে একদিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবে। সে ভাগ্য আর আমাদের হল কই? আজ তুমিও আবার চলে যাচ্ছ। ভাগ্যিস বইখানা কিনতে এসেছিলাম তাই দেখা হয়ে গেল।

কনক— তা ও সন্ধ্যাবেলায় বেরিয়ে তো পড়লি— বাড়ী ফিরতে পারবি তো? আজ রাতটুকু না হয় আমার বাড়ীতে কাটিয়ে কাল সকালে বাড়ী যেতিস।

আমি—পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা কর। সে রকম হলে তো হোস্টেলেই থেকে যেতে পারতাম। হয়তো দেবাশীষ সঞ্জয়দের মত আমার সাথেও একই ঘটনা ঘটতে পারে। যাক তোদের সাথে শেষপর্যন্ত দেখা সাক্ষাৎ হল, এটাই সান্ত্বনা।

রতন- কনক এসে যাবার বেলায় শেষ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলো। আমি ওদের দুজনকে জড়িয়ে ধরেছি। ওদের দুজনের দ্রুত হৃৎপিণ্ডের ওঠানামার শব্দ আমার হৃৎপিণ্ডে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কানের কাছে ফোঁপানির শব্দে আমার চোখেও জল বাধ মানছে না। সামনে দাঁড়িয়ে হতভম্ব মৌসুমী। তার চোখের কোন চিক চিক করছে কিনা বুঝতে পারছি না। হঠাৎ করেই বইয়ের প্যাকেট হাত থেকে নামিয়ে আমাকে টিপ করে প্রণাম করে ফেললো। আমি তো বিস্ময়ে হতচকিত। দুপাশে কনক রতনের বাঁধন আলগা হতে মৌসুমীকে বললাম- 'ভালো থাকিস'।

মৌসুমী— আবার কবে আসবে?

রতন-কনক—কথা দে- আবার কবে আসবি?

আমি—বলা মুস্কিল—কথা দিয়েও কথা রাখতে পারবো কিনা জানি না। ধরে নে এটাই হয়তো শেষ দেখা। তবে আমৃত্যু তোদের কাউকে ভুলতে পারবো না। হঠাৎই তরুনবাবুর দেওয়া তিনটা পেনের কথা মনে পড়ে গেল। সাইড ব্যাগ থেকে পেন তিনটে বার করে তিনজনের হাতে দিলাম। এটা আমার দেওয়া উপহার। মনে মনে ভাবলুম—আজ সঞ্জয় দেবাশীষ যদি আমার সাথে থাকতো তাহলে তারাও হয়তো তরুনবাবুর দেওয়া পেন দুটি এদের কে উপহার হিসাবে দিতে কোনও আপত্তি করতো না। তাদের 'ব' কলমে আমিও না হয় এই কাজটা করলাম।

মৌসুমী—তোমাদের আর একটা স্মৃতি আমার কাছে আছে।

আমি—আবার-কি স্মৃতি চিহ্ন তোর কাছে রয়ে গেল।

মৌসুমী—এ বছর সরস্বতী পূজোর সময় আমরা পাঁচজন একটা গ্রুপ ফটো তুলে ছিলাম মনে আছে? তরুনবাবু তার ক্যামেরায় তুলেছিলেন। আমাদের কাছে এক কপি করে আছে। হয়তো তরুনবাবু তোমাকে দিতে ভুলে গেছে।

আমি— না- আমি তার কপি পাইনি। কি আর হবে, স্মৃতির আর্কাইভে বন্দী করে রাখবো। এবার তোরা বাড়ী যা, আমার বাসের সময় হয়ে গেছে।

কনকরা বললো—না- বাস আসুক তোকে তুলে দিয়ে যাবো। এই কথা বলতে বলতেই বাস আসার শব্দ শোনা গেল। মিনিট খানেকের মধ্যে বাস এসে গেল। কনকরা বাসে লাগেজ তুলে দিল। বাসের চাকা গড়াতে আরম্ভ করলো, গেট ধরে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে চেয়ে হাত নাড়তে থাকলাম। ওরাও হাত নাড়ছে। ক্রমশ দৃষ্টি ঝাপসা হচ্ছে, মুখগুলি আর দেখা যাচ্ছে না। রতন, কনক, মৌসুমী— তিন ছায়ামুর্ত্তি, ক্রমশ অন্ধকারের পর্দায় ঢাকা পড়ে গেল।

(ক্রমশ)

গল্প

নষ্ট আর্তনাদ

ফজলুল হক

(রক্তের গভীরে সতত প্রবাহিত যৌনতার তাড়না, আর বহুকালাবধি মনের গভীরে লালন করে আসা মানবিক মূল্যবোধের দ্বান্দ্বিক সমীকরণে ধ্বস্ত এক নারীর জীবন-ভাষ্য)

দাড়াও কপাট খুলো না। একটু থামো।

খাটে রাখা বিধ্বস্ত কালকের কেনা চাদরটি খোলা বুকে জড়িয়ে বিছানায় সোজা হয়ে বসে পারেশা।

নিজাম দরোজার কাছাকাছি গিয়ে পেছন ফিরে দেখতে পায় পারেশার গোটা শরীর খোলা। শিরদাঁড়া নালির মতো নেমে এসেছে নিতম্বের গলিপথে। কোমর ঘেসে ভারী পাছায় মেদের ভাঁজ স্পষ্ট। বোগলের সোহাগভরা একতাল মাংসপিণ্ড বুক বরাবর জড়িয়ে রয়েছে। বিন্দু বিন্দু মুক্তোঘাম গোটা পিঠ জুড়ে।

এক পলকে পারেশা নিজামের চোখ দেখে অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারে, যেকোনো মুহূর্তে নিজাম আবার তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। সে ঘামে ভেজা বালিসটা টেনে নেয়। পেছন ঢাকার চেষ্টা চালায়। তখনও ঠকঠক কড়া নাড়ার শব্দ অবিরাম বেজে চলেছে বাইরের সদর দরোজায়।

নিজাম ঘরের দরোজার ছিটকানি পুনরায় লাগিয়ে পারেশাকে জাপটে ধরে।

ছাড়ো ছাড়ো। নিজেকে মুক্ত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যায় পারেশা।

দর্জা খুলা থাকলে তুকে দেখা যাবে নাকি? নাকি তুর গতর।

হাতের শিল্পকলায় অস্থির করে তোলে পারেশাকে।

ধ্যৎ তেরী সরো তো। কে ডাকছে দ্যাখো। সায়াটা কুনখানে ছুড়েছ খোঁজো। বে-আক্কেলের মতো কী যে কর। লজ্জা -হায়া কোরো একটু।

নিজামের মুখে আবিলহাসি। কয়েক পা পিছিয়ে আসে। পারেশা ছটফট করে, পোশাক খোঁজে, কাপড় চোপড় ছুড়ে ফেলে দাও কোনদিকে হুঁস থাকে না। দ্যাখো খাটের তলায়, ঢুকে গেল কিনা, খোঁজ।

নিজাম বাধ্য পুরুষ এখন। খাটের নীচে মাথা ঝুঁকিয়ে সায়াটা বের করে। পরে হাসতে হাসতে তার দিকে এগিয়ে দেয়। জানালার ফোকর গলে রোদ এসে পড়েছে পারেশার গায়ে। সে চিৎ হয়ে শুয়ে সায়ার মধ্যে পা গলিয়ে দেয়। ব্রা-ব্লাউজ পরে। এই দৃশ্যটি নিজাম নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে। আর মহান যৌনতার প্রতি আরও কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে। জীবনে তো কটা দিন, উপভোগ করা ছাড়া আর কীইবা করার আছে। এই অনুভূতিগুলো নিজামের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সে বলে, নাও হয়েছে? এবার কপাট খুলবো?

খুলো। ঢং..!

এবার থেকে কাজের মেয়েকে দুপুরে আসতে বারণ করবে। দরজা খুলে বলে, আমিও মানা করেছি অনেকবার, শোনে না। ধমকেছি, মেয়েটার লজ্জা বলে কিছু নাই।

আর তুমার? খেঁকিয়ে ওঠে পারেশা।

অবিন্যস্ত বিছানার চাদর আপাতত পেতে দেয়। নতুন চাদর আজই পেতেছিল, ধুতে হবে। বালিশ ঝেড়ে রাখে, ড্রেসিং টেবিলে নিজের মুখ নিজেই চিনতে পারে না। সুখক্লান্তির অবসাদ, এখন তার ঘুম আসছে। বিছানায় সুস্থির চাদর তাকে ডাকছে। এসব পলক পড়তেই মুঝে যায়। কে কড়া নাড়ছে। কাজের মেয়ে এত ব্যাকুল হয়ে কোনোদিন তো ডাকেনি।

পারেশা ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসে বারান্দায়। রেলিং দিয়ে ঘেরা বারান্দা। রেলিং পেরিয়ে ফাঁকা উঠান। সোজা সদর দরোজা দেখা যায়। সেখানে দাঁড়িয়ে নীল লুঙ্গি,হাফহাতা ময়লা জামা, তেলহীন বাদামী রঙের অবিন্যস্ত চুল, কাতর চোখে লোকটি। লোকটির আর্তনাদক্লান্ত ঠোঁট দুটি তার বুকের ভেতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে তোলে। সবকিছু ভুলে বারান্দা ছেড়ে পা ফেলতেই এক কম্পন শুরু হয়। শীতল অন্তহীন ধূসর হাওয়ায় অতীত উঠে আসে। যে অতীত মূল্যহীন, মৃত। এখন তাহেরকে চিনে ফেলার সাথে সাথে অন্তর অরণ্যে দাবানল জেগে ওঠে। সেই দাবানলে দাঁড়িয়ে তাহের নামের পৃথিবীর সব চেয়ে অবহেলিত দুঃখী মানুষ। এই আকস্মিক দৃশ্যের কিছুক্ষণ পূর্বের তৃপ্তি সুখের উন্মাদনার আবিল যাপনচিত্রগুলি মন ও শরীর থেকে মুহূর্তে হারিয়ে যায়।

তাহলে কোনো বিপদ হলো নাকি তার। ঠিক তখনই নিজামের চিৎকার। চেনা স্বর। পশুর থেকেও আতঙ্কময়। ভেতর পর্যন্ত শুকিয়ে যায়। মানুষটার আসল রূপ বেরিয়ে আসে।

এখানে কেন এসেছিস? হারামখোর। একবারই তোকে বলে দিয়েছি, আমার ঘরের দিকে মুখ ঘুরাবি না। হারামির বাচ্চা এসেছিস কেন?

পারেশা ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসে বারান্দায়। রেলিং দিয়ে ঘেরা বারান্দা। রেলিং পেরিয়ে ফাঁকা উঠান। সোজা সদর দরোজা দেখা যায়। সেখানে দাঁড়িয়ে নীল লুঙ্গি,হাফহাতা ময়লা জামা, তেলহীন বাদামী রঙের অবিন্যস্ত চুল, কাতর চোখে লোকটি। লোকটির আর্তনাদক্লান্ত ঠোঁট দুটি তার বুকের ভেতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে তোলে। সবকিছু ভুলে বারান্দা ছেড়ে পা ফেলতেই এক কম্পন শুরু হয়। শীতল অন্তহীন ধূসর হাওয়ায় অতীত উঠে আসে। যে অতীত মূল্যহীন, মৃত। এখন তাহেরকে চিনে ফেলার সাথে সাথে অন্তর অরণ্যে দাবানল জেগে ওঠে। সেই দাবানলে দাঁড়িয়ে তাহের নামের পৃথিবীর সব চেয়ে অবহেলিত দুঃখী মানুষ। এই আকস্মিক দৃশ্যের কিছুক্ষণ পূর্বের তৃপ্তি সুখের উন্মাদনার আবিল যাপনচিত্রগুলি মন ও শরীর থেকে মুহূর্তে হারিয়ে যায়।

বারান্দায় ঘুমিয়ে একটি ছাগল একটি কুকুর ও গোটা কয়েক হাঁসের বাচ্চা। বোটকা গন্ধ নাকে লাগে। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকে পারেশা। ততক্ষণে তাহের সব বাধা পেরিয়ে তার সামনে দাঁড়ায়। বেদনা চুঁয়ে চুঁয়ে পড়া উদ্বেগের কাতর দুখানি চোখ। তার অস্পষ্ট ঠোঁটের উচ্চারণ পারেশার উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে তোলে। গুমরে ওঠা নাভিমূলের আর্তনাদ মিশ্রিত কণ্ঠস্বর, পারু ! আমার আনু...

নির্বাক পারেশা এক অতি স্পর্শকাতরতায় তন্দ্রাচ্ছন্ন।

আমার আনু তোমাকে শেষ বারের মতো দেখতে চাইছে পারু, শেষ বারের মতো।

হাঁটু গেড়ে বসে তাহের। এই মানুষটিকে দীর্ঘ অতীত জীবনে মুহূর্তের জন্যও এমন অসহায় মনে হয়নি। মানুষটা কি সংবাদ দিতে এসেছে, কেন এসেছে এসব এলোপাতাড়ি চিন্তা তাকে পলকের মধ্যে এক গভীর শূন্যতার মধ্যে ঠেলে দেয়। তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। পৃথিবী যেন কোনো এক নৈঃশব্দে ঢুকে পড়ছে। ওই নিঃশব্দের ভেতর সে কেবল তাহেরের গলা শুনতে পায়। তাহের তার কাছে জানতে চায়।

কী হলো পারু ! কথা বলছনি কেন?

আর্তনাদক্লান্ত কণ্ঠস্বর শুনে পারেশা হাত বাড়ায়। সে হাত ধরে ফেলে নিজাম। গায়ের জোরে টেনে নেয়। পারেশা ঝাঁকুনি দিয়ে সরিয়ে দেয় তাকে, বলার চেষ্টা করে, কী হয়েছে আনুর !

নিজাম তার বড়ো বড়ো লাল চোখে তাকায়। তাহেরকে ধাক্কা মারে, যা এখান থেকে। না গেলে ঠ্যাং ভেঙে দেব।

পারেশার কণ্ঠস্বরে আতংক ভয় মিশ্রিত জেদ, কী হয়েছে আনুর? বলো বলো, ভয় করো না।

নিজাম তাকে গায়ের জোরে ঘরের ভিতরের দিকে টানতে থাকে। শাসনের ভঙ্গিতে আঙুল তুলে তাহের কে চলে যেতে

বলে। পরে পারেশার অর্ধচেতন অবসন্ন শরীর তুলে বিছানায় ফেলে দেয়। তখন ভিজে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসে। হাত বাড়িয়ে নিজামের পা জড়িয়ে বলে, যেতে দাও, আমাকে যেতে দাও। তোমার পায়ে পড়ি...

চারিদিকে বাতাসে আগুনে ঝলাস। চামড়া সেঁকে দিচ্ছে। দাঁতে দাঁত চাপা। হাতের মুঠি শক্ত। শ্বাস-প্রশ্বাসের ছোট ছোট তরঙ্গগুলি বালিশের উপর আছড়ে পড়ছে। তাকে চেপে ধরে নিজাম। ভিজে গামছায় চোখ, মুখ গলার ঘাম মুছিয়ে দেয়। এখন সে শান্ত। লম্বা ঘন কালো চুলে আঙ্গুলের ছোঁয়ায় আদর দিতে চেষ্টা করে। ভালো লাগে না পারেশার। সে চিৎকার করে হাত পা ছুঁড়ে বিরক্তি প্রকাশ করে। একসময় ক্লান্ত হয়ে বলে, আমাকে যেতে দাও...

নিজাম তাকে আরও কাছে টানে, তা হয় না সোনা, লোকে কী বলবে? আত্মীয় স্বজন ছিঃ ছিঃ করবে।

ওসব আমি জানি না,আমাকে একবার যেতে হবে, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে এখানে।

এক সময় অনেকে হাসাহাসি করলেও পারেশাকে শরিয়ত মেনে নিকাহ করার পর মানুষের মুখে কুলুপ এঁটে দিতে পেরেছে নিজাম। আবার নতুন করে লোকে আড়ালে নিন্দা করুক সেটা মেনে নেবে না সে। তাই সে আবার তাকে শাসন করে, চোখ লাল গম্ভীর কণ্ঠস্বর, চুপ! কথা বললে জিভ টেনে ছিঁড়ে দেব।

কর্কশ কণ্ঠস্বরে গোটা ঘর কেঁপে ওঠে। পারেশা ভয় পেয়ে তার চোখের দিকে তাকায়। অতি নিষ্ঠুর চোখ পলকহীন ক্রুদ্ধ দৃষ্টির হিংস্রতায় সে বালিশে মুখ লুকায়।

এই বালিস কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত অন্যরকম সুখ অনুভূতিপ্রবণ ছিল, এখন বোটকা দুর্গন্ধময়। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে তার।

দুই

সূর্যের তাপ সহ্যের নিয়ন্ত্রণে এলে নিজাম পারেশাকে বোরখা পরিয়ে তাহেরের ভাঙা ঘরের দরজায় পৌঁছে দেয়। পারেশা দ্রুত এগিয়ে যায়। তার পা কাঁপে হাতের মুঠোয় কীসের অস্থিরতা বুঝতে পারে না। খোলা উঠোন জুড়ে মানুষের ভিড় ঠেলে দাওয়ায় দেখতে পায় তাহের চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। একটি অচেনা মেয়ে তার মাথায় জল ঢালছে। সে টলতে টলতে সেখানে পৌঁছায়। তাহেরের মা তাকে দেখতে পায়। তার আর্তনাদ কথামিশ্রিত কান্না আর তাকে ঘিরে মহিলাদের কান্নাকথার ধ্বনিতরঙ্গে পারেশা নির্বাক একটি কাঠের পুতুল যার দৃষ্টি কেবল সচল, কিছু খোঁজার ব্যাকুলতা শুধু। শোক প্রকাশের এই রীতির ফাঁকে গোল টুপিপরা কায়েকজন মাদ্রাসার ছাত্র কাঠের দোনাজা উঠোনে রাখে। যারা শবদেহটিকে সাবানজলে গোসল করিয়ে সাদা কাফন পরিয়ে দিচ্ছিল,তারা বলল, যারা মুখ দেখতে চাও দেখে নাও।

সমবেত মানুষের চঞ্চলতা দেখল পারেশা। কী ঘটছে কাকে নিয়ে এই শবযাত্রার প্রস্তুতি, এসব তার মাথায় জট পাকিয়ে যাচ্ছে। সে দেখে, লাশের চারপাশে নারী পুরুষ গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। একজন ছোটখাট পুরুষ মানুষ যার মাথায় পরিপাটি চুলের উপর কাজকরা গোল টুপি, গাল ভর্তি দাড়ি কাঁধে সাদা চেক চাদর ভারী কণ্ঠস্বরে এক বদনা পানি চাইছে ঔজু করবে। তাহেরের মাথায় যে মেয়েটি জল ঢালছিল ভিড় কমে যাওয়ায় তাকে স্পষ্ট দেখ যায়। সে তাহেরের বেদনাকাতর মুখের দিকে চেয়ে ব্যাকুল হয়ে বলছে, ভাইজান একবার চোখ খোল, শেষবারের মতো তোর আনুর মুখখানা দেখে নে ভাই।

মহিলার কণ্ঠস্বরে এই বাক্যটি শোনার পর চেতনালোকে তীব্র আঘাত অনুভব করে পারেশা, মস্তিষ্কের ভিতর রক্তক্ষরণ শুরু হয়। সে দাঁড়িয়ে থাকবে যে পায়ের জোরে তা এখন অচল, শরীর কাঁপছে, এই অতিবিস্তারকারী শূন্যতার মধ্যে সে নিজেকে টেনে নিয়ে যায় শবদেহটির কাছাকাছি, আর্তনাদ ঢেকে দেয় মুখের শব্দ বাক্য। শুধু আনু শব্দটি আর্তনাদের আতঙ্ক ছাড়িয়ে চারপাশের মানুষগুলিকে স্তব্ধ করে দেয়। গোটা পরিবেশ নৈঃশব্দের মধ্যে তলিয়ে যায়।

কতটা সময় পার হলো তার হিসেব নেই। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে ওঠে, মা বটেরে, খুলে দে মুখ। দেখতে দে।

সেইসময় তাহেরের সহজ সরল মা ছুটে আসে, সেই এলি মা টুকজিন আগে এলে ছেলের মুখে পানি দিতে পেতিস।

মেয়েদের ফুসফাস গুঞ্জন তখন উঁচুস্বরে পারেশার কানে পৌঁছে দিতে ব্যস্ত।

'ডান ডাখিনি খবিশ ঢেমন মাগী—মা ফলাতে আলছিস? ছেলেটাকে খেলি আবার কীসের লেগে ছেনালী করছিস?'

এই বাক্যগুলি কিছুটা পারেশার কানে গেল বাকিটা শুনতে পেল না। সে তাহেরের মাকে জড়িয়ে লুটিয়ে পড়ল।

দাঁত লেগেছে। ওমন হয়। ছেলের শোক।

একটি মেয়ে পারেশাকে মেঝেতে শুইয়ে দেয়, কে রইছিস লো মাথায় পানি ঢাল।

যে বদনায় জল আনল সে বিরক্ত সহকারে বলল, ঢং!

লাশ গোরস্থানের দিকে এগিয়ে যায়। পেছনে মানুষের সারি। লাল মাটির সরু বিষণ্ণ পথ। দিগন্তে গাছের ফাঁকে রোদকণার নৈসর্গিক রূপখেলা। যেখানে মানুষের শোকতাপ স্পর্শ করে না। পেছনে পড়ে থাকে স্বজন হারানোর কান্নাধ্বনি।

জলের ঝাপটায় চোখ খোলে পারেশা। তাহেরের মা বলে, আল্লাহর জিনিস আল্লাহ নিয়েছে। দুঃখ করিস না। তুর কপাল মন্দ, জান থাকতে ছেলেটাকে দেখতে পেলি না।

এসব সান্ত্বনা তার কানে ঢুকছে না। একটি শব্দতরঙ্গের সাথে ভিতরে ভিতরে যুদ্ধ চলছে। সে দেখতে পাচ্ছে সারি সারি মানুষের ভিড়ে পা মিলিয়ে হাঁটছে নিজাম। তার দাম্ভিক চলন, হিংস্র চোখ,আর কর্কশ চিৎকারে বুকের ভিতর পর্যন্ত শুকিয়ে যাচ্ছে। তবুও সে ভয় পাচ্ছে না। চোখে চোখ রেখে সে প্রতিবাদ করছে। ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, একটি কাফন ঢাকা লাশ, এক টুকরো সোনার ছেলে আর শববাহী দোনাজা।

পারেশার ক্রোধ সময়ের কাছে হেরে যায়। ছবিটাও পাল্টে যায়। সে দেখে একটি মাটির কুঁড়েঘর। উঠোনে রান্নাশালে লাউ এর মাচা। ঝুলে থাকা কয়েকটি কচি লাউ। ঈশাণ কোণে দরজা ঘেসে গাছভর্তি সজনে ফুল। বাইরে তাহেরের গলায় ছেলে আনুকে নিয়ে উটপটাং ছড়ার সোহাগ। ছেলে কোলে নাচে। পারেশাকে ডাকে, পারু ও পারু একবার এসো এদিকে, তোমার ছেলের কাণ্ড দেখে যাও।

পারু জানে ছেলেকে নিয়েই তার জীবন। খাওয়ানো, গোসল করানো,জামাপ্যান্ট পরিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া---এসব কোনোটাও করতে হয় না পারেশাকে। এরপরও সে বিরক্ত হয়ে বলে, আমার অনেক কাম পড়ে রইছে, ওসব তুমি দেখছো দেখ।

দরজায় বসে গাঁয়ের সড়ক দেখা যায়। দেখা যায় তাহেরের অভিমানভরা মুখ, বেদনার্ত জলভরা চোখ। সে জল গড়ায় না। ভিন্ন ভিন্ন সরল ও বক্র রেখায় ভাগ হয়ে কাতর মুখমণ্ডল জলের আস্তরণে ঢেকে দেয়। সে দৃশ্য পারেশার দৃষ্টিগোচর হয় না। গাঁয়ের মসজিদ থেকে আজান ভেসে আসে। তাহের তার মায়ের কোলে আনুকে থুয়ে নামাজ পড়তে যায়। রাতে ছেলেকে সোহাগ করে। ঘুমিয়ে পড়লে মায়ের পায়ে তেল মালিশ করে দেয়। মা ঘুমিয়ে পড়লে তাহের বিছানায় আসে। পারুর খোলা শরীর দেখে বিরক্ত হয়ে চাদরে ঢেকে দেয়। তারপর বিছানার একপাশে কাৎ হয়ে শোয়।

যন্ত্রণায় ফুসতে থাকে পারেশা। সে এক তীব্র দহনজ্বালায় গভীর অন্ধকারের ভিতর আরও অন্ধকারময় শূন্যতায় ডুবে যায়। ওই চরম নৈঃশব্দের মধ্যে তাহেরের নাক ডাকার শব্দ অসহ্য হয়ে উঠলে সে বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে আসে খোলা মাঠে। আকাশের পানে মুখ তুলে ধরে। নিশি ডাক শোনে। কার বাঁশি বাজে। জাদু আছে ওই বাঁশির সুরে। হাতছানি দেয়। চেতন অবচেতনে এইসব নৈশ-নকশার মধ্যে কার করুণ আর্তনাদ ভেসে আসে।

মা-মা-মা

লাফিয়ে ওঠে পারেশা। অঘটন আতঙ্কে সে চিৎকার করে, আমার আনু! আমার আনু কই!

পাহাড় থেকে বিগলিত ঝর্ণা ধারার মতো নাভিমূল থেকে গুমরে ওঠা কান্না আছড়ে পড়ে গোটা উঠোন জুড়ে।

শত অপরাধ করলেও তাহেরের মা তাকে ক্ষমা করে দেয়। তাকে বুকে জড়িয়ে নেয়। সান্ত্বনা দেয়, কাঁদিস নে মা, মনে মনে আল্লাহকে বল, তোর আনু যেন জান্নতের আলো দেখতে পায়।

পারেশার কান্না থামে না। আরও জোরে প্রাক্তন শাশুড়ি কে জড়িয়ে ধরে। তাহেরের মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, কতবার তোকে দেখতে চেয়েছে আনু। কতবার যে মা মা বলে কেঁদেছে। আমার ছেলের বুদ্ধিসুদ্ধি কম,কিন্তু তার মতো মানুষ এ তল্লাটে নাই, এ আমি কসম খেয়ে বলতে পারি।

গোরস্থান থেকে ফিরে তাহের মাথা নিচু করে পারেশার কাছাকাছি দাঁড়ায়। গ্রামে রাত এসে পড়েছে। যতটা না দয়া করুণা হয় তার চেয়ে প্রয়োজনে তাহের খুব বেশি অস্থির হয়ে ওঠে। পারেশা নৈঃশব্দের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পায়, কোথায় রেখে এলে আমার আনুকে?

তাহেরের শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে হয়তো এখুনি। ঘরে তখনও নারী পুরুষ কয়েকজনের ভিড় ছিল। শূন্য মস্তিষ্কে দাওয়ায় বসে। তার চোখে কোনো জল ছিল না। ছিল বোবা দৃষ্টি। এই সময়টুকু পেরিয়ে যেতে সময় লাগে অনেকটা। তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে বলে, নিজাম ভাই তোমাকে পৌঁছে দিতে বলেছে।

অনিয়ন্ত্রিত শ্বাস পতনে অস্পষ্ট স্বরে পারেশা বলে, আমাকে একবার কবরগাঁয়ে নিয়ে যাবে!

তিন

পর পর অনেকগুলো রাত চোখের পাতা এক করতে পারেনি। সে এই কয়দিনে বুঝতে পেরেছে, খাটের তোষক গদি যা এতদিন উপভোগ করেছে আসলে তা শক্ত লোহা অথবা কাঠ, ঠেকলেই পিঠে ব্যথা করে। বালিশ যেন ইটের টুকরো। আর রাত যেন বিষাক্ত সাপ। ছোবল মারে অনবরত। এই বিছানায় একটা বছর যে কাতরানিগুলো দীর্ঘশ্বাসগুলো যৌনক্রিয়ার সময় আপনা থেকেই ঝরে পড়ত, তাৎক্ষণিকভাবে মুখে উচ্চারিত শব্দ সেই সাথে দেহভঙ্গিমা ও অবস্থান সেইসব অশ্লীলতা রক্তে ও মস্তিষ্কে আগুন ধরিয়ে দিত এখন তা তুচ্ছ,অনৈতিক মনে হল তার। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে পারেশা। হামলে ওঠে। আল্লাহর কাছে হাত তুলে প্রার্থনা জানায়, হে আল্লাহ আমাকে তুমি তুলে নাও। এই রাত যেন শেষ রাত হয়। আমাকে জাহান্নামের আগুনে পোড়াও। এ জীবন আমি চাই না।

পাশে যৌনসুখক্লান্ত নিজাম কোঁ কোঁ শব্দে নাক ডাকছে। সেই শব্দ পারেশার বিরক্তির মাত্রা অতিক্রম করে। ঘৃণায় ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। কাছাকাছি কুকুর কাঁদে। সেই কান্না তার জঠরে ঢোকে। সে বিছানায় উঠে বসে।

তিনদিন আগে সে কাঁচা কবরের পাশে গিয়ে বসেছিল তাহেরের হাত ধরে। চারপাশে নৈঃশব্দের আতঙ্ক স্তব্ধতা। তাহের তার হাত ধরে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছিল যার একটি বর্ণও তার কানে ঢোকেনি। তার কানে কেবল আনুর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট হচ্ছিল। মা মা তুমি ফিরে এসো মা।

এখন এই ঘরে সে কেবল একা শোককাতর। এই বিছানায় শোকের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তার এই অবসন্ন শরীর নিজামের শরীর খেলা থেকে রেহাই পায় না। কদর্য পাশবিক যৌনতায় তার তলপেটের মাংস ছিঁড়ে খায়। তার উল্লাস আগুনে পারেশা পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

ছটফট করে সে। নিজাম ঘুমালে সে বাইরে আসে। বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়ায়। বারান্দার পর কংক্রিটের লম্বা চওড়া উঠান। তাহেরের মাটির ঘরের উঠোন এমনটা নয়। যেখানে দাঁড়িয়ে তাহের আপন মনে কত কথাই না বলতো। পারেশা শুনতে চাইত না। আজ সেসব ভেবে তার মায়া হলো। লোকটা চিরকাল একই রকম। কোনো দাবি করে না, পুরুষের অধিকার চাপিয়ে দেয়নি কখনও। শুধু শুনেছে,আদেশ পালন করেছে। গোলাম। বোকা।

পারেশার পেট যেদিন ভারী হলো, তাকে জানান দিতে পারেশা বলেছিল, নাজু ভাইদের গাছ থেকে কটা আমড়া পেড়ে এনো তো।

হাবাগোবার মতো তাকিয়ে ছিল। কেন সে প্রশ্নটা করার সাহস ছিল না।

এসময় আমড়ার টক ভলো লাগে।

তবুও হাঁদারাম বুঝতে পারে না। এমন অনেক কিছু বুঝতো না সে। পুরুষের স্বাভাবিক চাহিদা, শরীরী ক্ষুধা। তাকে জাগিয়ে নিতে হতো। বুঝিয়ে দিতে হতো।

তিন দিন আগে কবরের পাশে বসে পারেশা কেঁদেছিল বহু সময় ধরে। তখন তার মনে হয়েছিল তাহের হয়তো রাতটা তাদের ঘরে থাকার কথা বলবে। বলেনি। লোকটা তার কাছে কিছুই চায়নি। এই না চাওয়াকি তাকে ছেড়ে আসার কারণ? প্রশ্নটা নিজের কাছে করে পারেশা। কীভাবে গাঁয়ের লোক ডেকে তার কাছে তালাক চেয়ে নিয়েছিল, একমাত্র সন্তান আনুকে ফেলে চলে এসেছিল এসব ভাবতে গিয়ে তার নিজের গালে চড় মারতে ইচ্ছে করে। আবার সে ঈশ্বরের কাছে হাত তোলে, আমাকে তুলে নাও। আমি আর বাঁচতে চাই না।

পেছন থেকে নিজাম তাকে টানে, কী করছ এখানে? এসো বিছানায় এসো।

তারপর আরও গভীর অন্ধকারময় তন্দ্রার মধ্যে জড়িয়ে নেয় নিজাম।

অন্ধকার থেকে পাথর শরীর যখন শ্বাস নিল তখন নিজাম ক্লান্তি সুখে ঘুমের দেশে পৌঁছে গেছে।

পারেশা বিছানা ছাড়ে। সবরকম ভাবনা চিন্তা ঝেড়ে ফেলে ধীরে ধীরে দরোজার তালা খোলে। উঠানে এসে দাঁড়ায়। গোটা আকাশ তার মাথার উপর। সে প্রাণভরে শ্বাস নেয়। পরে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়, সদর দরোজা খুলে লাল মাটির রাস্তায় পা রাখে। তারপর পথ হাঁটতে হাঁটতে কোথায় যে পৌঁছাবে তার জানা নেই। সে কেবল পা ফেলে এগিয়ে যায়। প্রতিটা পদক্ষেপে এক শিশুর আনন্দ-আর্তনাদ তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। আর সে স্পষ্ট দেখতে পায়, তার আনুর মুখ, হাত ইশারায় সে ডাকছে, মা তুমি আসছ! মা মাগো তাড়াতাড়ি এস, দেখছ না পুবদিকের আকাশ ফরসা হয়ে আসছে।

ধোঁয়াশা

আমিনুর রাজ্জাক দফাদার

(শিল্পী-সাহিত্যিকরা তাঁদের উপর অর্পিত দয়বদ্ধতাকে প্রায়শ বেশ একটু পাশ কাটিয়ে যান, কখনো কখনো রীতিমতো বুড়ো আঙুল দেখান। এক্ষেত্রে তাঁদের এই অবস্থানের প্রতিস্পর্ধী অবস্থানে ভাস্বর হয়েছেন গল্পকার। শৈল্পিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা কাঙ্ক্ষিত মাত্রা পেয়েছে এখানে।)

আরাফত আলির জাপানি রাইয়ের জমিতে পড়ে আছে একটা লাশ। দূর থেকে দেখে মেয়েটিকে যুবতী মনে হচ্ছে। শ্যামবর্ণ গায়ের রঙ। লম্বা নাকে একটা রুপোর নথ। পায়ে রুপোর দুলে রক্তমাখা। মোটা মোটা চোখ দুটো আকাশ নিরীক্ষণে ব্যস্ত।

শীতের কুয়াশা কাটেনি। আরাফত আলি জমিতে সেচ দিতে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। মেশিন রেখে ছুটে গেল মসজিদে। মসজিদের সর্দারকে সমস্ত কথা কম্পিত কণ্ঠে বলে আরাফত। সর্দার সাহেব মাইকে অ্যানাউন্স করেন, 'আসসালামু আলাইকুম। বিশেষ ঘোষণা—আরাফত আলির জাপানি রাইয়ির খেতে একটা মেয়ির লাশ পড়ি আচে। গাঁয়ির প্রতিডা মানুষ চাঁদমারির মাটে চলি যাও।'

চাঁদমারি মাঠে সিন্দু গ্রামের অসংখ্য মানুষ। ফসল মাড়িয়ে ছুটছে আরাফত আলির জাপানি রাইয়ের জমিতে। কে একজন চিৎকার করে বললো, 'এ তো রবিন দাসের মেয়ি পার্বতী।'

সঙ্গে সঙ্গে ফোন। পুলিশ স্পটে আসেন। রিপোর্টাররাও একে একে চলে আসেন। রক্ত পড়ছে পার্বতীর কয়েষ ও পা গড়িয়ে। গলায় ওড়না জড়ানো। সবাই বলছে, 'ধর্ষণ করি গলায় ওড়না জড়িয়ি মেরিচে।'

আরাফত আলি কাঁপছে থরথর। মনে মনে ভাবছে, 'শেষে আমাকেই না দোষ দেয়। আল্লা ইজ্জত বাঁচাও। তিন মেয়ির পর এক ছেলি। আমাকে ধরলি ছেলিপিলি মাটে মরবি। বিপদ কেটি গেলি এ সিন্দু গাঁয়ি আর থাকবু না।'

সিন্দু গ্রামের শেষ প্রান্ত। যেখানে প্রতিদিন সূর্য অস্ত যায়। সেখান থেকে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসছে রবিন দাস ও তার স্ত্রী ভাগবতী। ভাগবতীকে কেউ আটকাতে পারছে না। নিজের বুকে চাপড় মেরে কাঁদছে। শেষ বয়সে কত মানত, ডাক্তার দেখিয়ে পার্বতীর জন্ম। মাধ্যমিকে ছিয়াত্তর শতাংশের বেশি নাম্বার পেয়ে পাস করেছে। বর্তমান টুয়েলভের ছাত্রী পার্বতী।

মেয়েকে দেখে নিজেদের আয়ত্তে আনতে পারলো না। শিরা-উপশিরায় আগুন জ্বলে ওঠে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো বুকে আছড়ে পড়ে স্মৃতিবিজড়িত দিনগুলি। দারোগা বাবু একটা

ডায়েরি হাতে রবিন দাস ও ভাগবতীর সামনে দাঁড়ালেন। রিপোর্টারও আছেন। দারোগা বাবু প্রশ্ন করেন গম্ভীর মুখে, 'আপনারা কি কাউকে সন্দেহ করেন ?'

রবিন দাস গুমড়ে কেঁদে ওঠে বলে, 'আমি তো কারু খতি করিনি বাবু। কার দোষ দবু !'

ভাগবতী দাস বুক চাপড়ে কেঁদে উঠে বলে, 'চক্কর্তী পাড়ার চারজন ছেলি এক বচর ধরি আমার মেয়িকি জ্বালাইচি বাবু। পার্বতীর বাবা ঝামেলা নাগাবে বলি উনাকে কিচু বলিনি। আমি ওদের বাবাদের বলি এয়েচি অনেকবার। কুনু লাব হলু না বাবু।'

দারোগা বাবু কলমটা দিয়ে মাথা চুলকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলেগুলোর নাম কি ?'

'নরেন চক্কর্তী, অমিত চক্কর্তী, রাম চক্কর্তী আর আদিত্য চক্কর্তী। আমার মেয়িডাকে শেষে খুন করি মারলু গো। কাল আমার ছোট ভাইকি দেকতি গিয়িলাম। ক্যান্সার হয়িচে ভাইয়ির। কুড়ি ঘর মুচির কেউ দেকিনি আমার পার্বতীকি।'

আরাফত আলির মুখমণ্ডলে ভয়ের ছাপ। চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। মনের অতল গহ্বর থেকে চিৎকার করে বলে, ' ভাগবতী বৌদি চুপ করো। তুমরা হেরিয়ে যাবা এই তুফানে। আমার উপর ভরসা করু না। আমরা সংক্যায় কুম। শেষে কার দোষ কার ঘাড়ে পড়ে।'

দারোগাবাবু চিৎকার করে ডাক দিলেন, 'জমির মালিক কে ? এদিকে আসুন। আপনার নাম বলুন।'

আরাফত আলি দুই হাত জোড় করে বলল, 'ছার আমার নাম আরাফত আলি হালসোনা। আমি রাইয়ির ভুঁয়ি পানি দিতি এসি দেকি মেয়েডা মরি পড়ি আচে। এ ছাড়া আমি কিচু বলতি পারবু না।'

দারোগা বাবু বুঝলেন আরাফাত ভয় পেয়েছে চরম। জমির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখে বোঝা যায় ওর মৃত্যুর উপর মৃত্যু। দারোগা বাবু তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলেন আরাফতকে ও রাইয়ের জমিটা।

দুই

পরের দিন। লাশ নিয়ে টানা হেঁচড়া। বিভিন্ন পার্টির লোকেরা লাশ নিয়ে স্লোগান দেবেন। কিন্তু পুলিশ এখানে তৎপর। লাশ চলে আসে সিন্দু গ্রামে। উপর মহলের অর্ডার মানতেই হবে। কিন্তু কোন উপরমহল সেটা নির্দিষ্ট করে বুঝতে পারল না কেউ।

ভাগবতী দাস পার্বতীর উপর ঝাঁপিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। গলা দিয়ে ফ্যাসফ্যাসে আওয়াজ বেরিয়ে আসে। কান্নার দলা অসহনীয় যন্ত্রণায় বুক ও গলায় ছটফট করে। ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে বলে, 'আরাফত ভাই সাক্কি দিস। তুই যেদি দেকি থাকিস, বলিস ভাই। মুচির মেয়ি বলি অবহেলা করিসনি।'

আরাফত চাদরে মুখ ঢেকে পালাবার চেষ্টা করে। মতু দাস পূজার ঢাক বাদক। বয়স চল্লিশের ওপর। ওর হাত ঢাকে পড়লে দেব-দেবী মাটির খোলশ ছেড়ে জীবন্ত হয়ে উঠেন। সে গম্ভীর গলায় বলে ওঠে, 'আরাফত ভাই তুমি কি সত্যিই কাউকে দেখিলি ?'

'না। ধুঁয়োর মেতুন কুঁয়াশা। কি করে বুজবু কে বা কারা দেঁড়িয়ে ছেলো।' কথাটা বলে জিভে কামড় মারে আরাফত আলি।

'পুলিশ জেরা করবি। ভুল ভাল উত্তর দিয়ু না ভাই।' অন্ধকারের ভিতর থেকে মতু দাস বলে উঠলো।

আরাফত রবিন দাস ও ভাগবতী দাসের দিকে দূর থেকে তাকিয়ে মনে মনে বললো, 'সিন্দু গাঁয়ি একশো ঘর মুচুমান। গাঁয়ির শেষে কুড়ি ঘর মুচি। আর বাদবাকি সব জাঁদরেল হিঁদু। ছাগল পারবি বাঘের সাথে নড়াই করতি ? সাক্কি দিতি গিয়ি মরবু ! বলবি ও ভারতের নয়। তেকুন কী হবে ! দেশে কি চলচি দেকচু না। দুহাজার সালে দাদুর পুরুনু জমির দলিল ভেসি গিয়িচে। গাঁ ছাড়তি পারি কেনতু দেশ ছাড়ি কী করি !'

রবিন দাস ও ভাগবতী দাস কাঁদতে পারছে না। তবুও টনটন করে ওঠা মন বোঝে না। শ্মশানের দিকে মেয়ের মুখ। সেই মুখ দেখতে গিয়ে অজ্ঞান ভগবতী দাস। অজ্ঞান চোখে সে নিজেকে কালী রূপে দেখে হতবাক। সে এক হাতেই বিনাশ করছে পৃথিবীর অশুভ শক্তি। ভারতবর্ষের ধর্ষকদের মুচি পাড়ায় মা কালির পায়ে ফেলে গলায় পরিয়ে দিচ্ছে ফাঁসির দড়ি।

চিৎকার করে কে যেন ডাকছে ভাগবতীকে। ধীর চোখ মেলে দেখে আরাফত। ভাগবতী দাস ককিয়ে উঠে বলে, 'আরাফত ভাই আমার। গরীবির মেয়িডাকে মেরি ফেললু রে। কালি মা এর বিচার করু।'

ভাগবতী দাসের মুখে বারবার ভাই ডাক শুনে আরাফতের অন্তরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে বলে, 'আমি জানি কারা তুমার সুনার চাঁদ মেয়েকি খুন করিচে। তুমার মেয়িকি ওরা চারজুনা মেরি আমার ভুঁয়ি ফেলি পেলিয়িচে। '

মুচি পাড়ার লোকেরা আরাফতের ঘাড়ে হাত দেয়। মরা পার্টির নেতারা ঘুরে দাঁড়ান। সেখানেই রিপোর্টাররা ওত পেতে বসেছিলেন। মাইক্রোফোন মুখের সামনে ধরে জিজ্ঞেস করেন, 'তারা কারা ? নাম বলুন ? ধর্ষকদের উপযুক্ত শাস্তি হোক। সাধারণ মানুষ জানুক।'

আরাফতের ছলছলে চোখ হঠাৎ বাঘের মত জ্বলতে থাকে। সে বুক ফুলিয়ে বলল, ' নরেন চক্কর্তী, অমিত চক্কর্তী, রাম চক্কর্তী ও আদিত্য চক্কর্তী।'

মুহূর্তে সমস্ত মিডিয়ায় খবর ছড়িয়ে পড়ে। আরাফতকে অনেকেই বাহাদুরীর জন্য সম্মান জানান। কেউ বাঁকা চোখে তাকান। মুসলমানদের ভিতরে অনেকেই বলেন, 'শালা তুই একটা মাতামুটা। হিঁদুর ঝামেলা মুচুমানের ঘরে ক্যানে আনতে গেলি। মুচিরা কেউ কিচু বলচি না। বায়াদুরি কেলাইচি। ওহে ওই চক্কর্তী পাড়া দিয়ি আমাদের মেয়িরাও ইস্কুলে যাই, কলেজ যাই। একুন থেকে রেগি থাকবি উরা। যেদি ক্ষতি করে? প্রতিশোদ নেবেই দেকিস।'

কিন্তু আরাফত ভীত ও চাটুকারদের কথায় কান দেয় না। কুঁয়াশার ভিতর ঐ চারজন যখন পার্বতীকে মেরে ফেলে চলে গেল, সেই দৃশ্য চোখে ভেসে উঠলে, বুকের ভিতরটা ছটফট করে। ওর মন বলে ওঠে, 'তোর যেদি নিজির মেয়ি হতু পার্বতী ! তুই একটা মানুষ না ধর্ম মানুষ ! সত্যি কতা বল আরাফত। আল্লা যেদি তোকে মুচির ঘরে জরমাতি দিত?'

তিন

পুলিশ চারজনকে অ্যারেস্ট করেছে ঠিক। কিন্তু পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে অন্য কথা—পার্বতীর হিস্টোরিয়া রোগ ছিল। ব্রেনের সমস্যা ও রাতে ঘুমের ভিতর হাঁটা এবং এইসব রোগ থেকে আত্মহত্যার প্রবণতা। অথচ কোথাও লেখা নেই পার্বতীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। তবে মানুষ থেমে নেই। আন্দোলন চলছে।

আরাফত নিজের রাইয়ের জমিতে দাঁড়িয়ে। চোখ থেকে ঝরে পড়ছে টপটপ করে পানি। ভেবেছিল রাই উঠলে ধান লাগাবে। রাই বিক্রির টাকা দিয়ে অনায়াসে সংসার খরচ ও ধান চাষ হয়ে যাবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয়ে যায় অন্য। মানুষের পায়ের তলায় ধুলিস্যাৎ সমস্ত ভাবনা ও অন্ন। কাল তাকে সাক্ষী দিতে কোর্টে যেতে হবে। রবিন দাস ও পার্বতী দাস দিনে রাতে তিন- চারবার আরাফাতের বাড়ি এসে বলছে, 'আরাফাত আমার মেয়ি তোর নিজির মেয়ির মেতুন ভাই। ঠিক করি সাক্কি দিস। কতু কষ্টে মেয়িডা মরিচে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জমির আলে বসে আরাফত একধ্যানে ভাবতে থাকে গত রাতের কথা। চক্রবর্তী পাড়া থেকে জনা পাঁচেক মানুষ এসে তাকে সাক্ষী না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। এমনকি ওর স্ত্রীকেও বলেছে অনেকবার। আরাফত যদি অসুস্থতার ভাণ করে সাক্ষী দিতে না যায়। তাহলে তাকে পুরস্কার দেবে। তারপর যা করার তারা করবে। গ্রামের কোন মানুষ খারাপ কথা পর্যন্ত বলার সাহস পাবে না। খাবারের কোন অসুবিধা হবে না। চক্রবর্তীদের উৎপাদনশীল কিছু জমিও তাকে দেবে। বাম হাত দিয়ে নিজের চুল ধরে একা একাই বলে, 'আল্লা একুন কী করি ! দুনিয়া চার দিনির। পরকাল — ! কবরে গিয়ি আমি কি উত্তর দবু। জাত- ধর্ম, না একটা মানষির খুনের কাঁদুন ! কী করবু একুন ? অবাবের সুংসার আমার। সুংসার বাঁচাতি তো হবেই। মুচিদের হেঁদুও ভাবে না কেউ। মরা পশু-পাকির গোস্ত খায় ওরা। কি হবে মুচির মেয়ির কতা ভেবি ?'

সারারাত বুকের ভিতর ছটফট করে। ঘুমোবার চেষ্টা করেও পারে না। অপরাধ বোধ বুক খামচে ধরে। পার্বতীর সম্পূর্ণ চেহারা চোখে ভাসে। স্কুল ড্রেস পরে পার্বতীর স্কুলে যাওয়া স্পষ্ট দেখতে পায় আরাফত। সে যেন তার মায়ের রূপে এসে বলছে, 'বাপ ঈমান হারাসনি। দুনিয়া ক'দিনির। মরতি একদিন হবেই। মানুষের মতন বাঁচ।'

চোখ বন্ধ করলেই পার্বতী ডাকছে, 'আব্বা, আমাকে বাঁচাও।'

আঁতকে ওঠে আরাফত। কান্না করে। নিজের স্ত্রী সন্তানদের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর মন একটাই কথা বলে, 'আরাফাত একদিন সবাইকি ছেড়ি চলি যেতি হবে। খালি হাত — !'

কয়েকটা শক্ত পায়ের শব্দ আরাফতের দিকে এগিয়ে আসে। কারা যেন জাপটে ধরেছে তাকে। সে প্রাণপণে চেষ্টা করে নিজেকে ছাড়াবার। কিন্তু চোখ থেকে ঘুম ছাড়ে না। সে অনুভব করে, একটা গাড়ি দ্রুতবেগে তাকে নিয়ে ছুটে চলেছে কোথায়। সে জানে না।

সকালের ঘন কুঁয়াশায় পাখিদের সাথে সিন্দু গ্রামের অধিকাংশ মানুষের চিৎকার, 'আরাফাত নিরুদ্দেশ কেন ?'

এষণা

এক দেশহারানো মানুষের সন্ধানে

হাসিবুর রহমান

(হাজার বছরের বাঙালির জাতীয় ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ক্ষতের দিক সাতচল্লিশের দেশভাগ। দেশভাগের দুঃসহ যন্ত্রণায় এখনো নিয়ত দগ্ধ হচ্ছেন অনেকেই; বিশেষত ঘরহারারা। এমনি এক ঘরহারার হৃদয়ার্তিকে তপ্ত হয়েছে এ রচনার অঙ্গন)

১

এ বছর ফেব্রুয়ারির শেষ দিকের কথা, ছুটির দিন। দুপুরের আহার সেরে বই হাতে কখন যে দিবা-নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিলাম! হটাৎ বেজে ওঠা মোবাইলের রিংটোনে অকাল তন্দ্রাচ্ছন্নতার মুক্তি ঘটল। উঠে দেখি—প্রফেসর মাজহারুল হান্নান সাহেবের ফোন। সালাম দিতেই ওপার থেকে উত্তর এলো, 'শুনুন, আমি এখন আপনাদের শহরে। জঙ্গীপুর থেকে ইতিহাস সংসদের সেমিনার শেষে বহরমপুরে ঢুকছি, সম্ভব হলে চুয়াপুরে হোটেল 'কিং' এ চলে আসুন। হাতে একদমই সময় নেই, কোনো রিজার্ভেশন ছাড়াই আগামীকাল আর্লি মর্নিং এ ট্রেন ধরতে হবে। আসুন, সাক্ষাতে কথা হবে।'

উনি প্রবীণ মানুষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত ইতিহাসের অধ্যাপক; আমার মাস্টারমশাই প্রফেসর শাহনূরুর রহমানেরও খুব কাছের মানুষ। দেরি না করে হোটেলে গিয়ে দেখি—উনি দোতালার একটা রুমে ফোনে ব্যস্ততার সঙ্গে কথা বলছেন, মেঝেতে এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রমহিলা সন্ধ্যার নামাজে দাঁড়িয়েছেন। বুঝলাম, উনি হয়তো স্যারের সহধর্মিনী। পরে বুঝলাম আমার অনুমান ভুল ছিল না। যাইহোক ফোন ছেড়েই উনি আমাকে কোথায় বসতে বলবেন তা নিয়ে বড্ড শশব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। পরিস্থিতি উপলব্ধি করে আমি বললাম— 'স্যার,আপনি অহেতুক আমার জন্য চিন্তা করবেন না,আপনারা নামাজ পড়ে সময়মতো আসুন, আমি নিচে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছি।

২

যাইহোক বাড়ির দুয়ারে এভাবে প্রফেসর হান্নানের সাক্ষাৎ পাওয়া আমার জন্য ভাগ্যের সুপ্রসন্নতা বলেই মনে হয়েছে। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আমি পার্টিশন নিয়ে ভিন্নধর্মী একটা কাজে আগ্রহী হয়ে উঠেছি। কাজটি সম্পন্ন করতে হলে প্রয়োজন দু'পারের দেশ হারানো মানুষের মর্মবেদনার জীবন-কথা ভিত্তিক মৌখিক উপাত্ত, স্মৃতিকথা, হারিয়ে যাওয়া ভিটে বাড়ির নমুনা—এমন অনেক কিছু বহুমুখী উপাদান দরকার। এপারের দেশ হারানো মানুষদের জীবন কথা ভিত্তিক লিখিত উপাদানের অভাব আছে যথেষ্ট। তাঁদের যথার্থ ইতিহাস আজও লিখিত হয়নি। কেন হয়নি তার কারণ অনেক কিছুই থাকতে পারে, আবার যাঁরা দেশ ছেড়েছেন তাঁদের ব্যক্তিগত অনীহা; হয়তো বা আত্মপরিচয়ের বেড়া ভেঙে রিফিউজি হওয়ার গ্লানি বহন করতে চাননি তাঁরা। এপার থেকে ওপারে গিয়ে বিখ্যাত হয়েছেন যাঁরা তাঁদের কেউ কেউ অবশ্য শিকড়ের পরিচয় দিয়েছেন অকপটে; আনিসুজ্জামান, বদরউদ্দিন উমর, আবদুল হাই, মান্নান সৈয়দ, হাসান আজিজুল হক, মাহমুদুল হক, শওকত ওসমান প্রমুখ। তবে একথাও ঠিক যে সিংহভাগ সামাজিক পরিচয়হীন দেশান্তরিত মানুষরা ওপারে নিজেদের হীনম্মন্যতাবোধ থেকে শিকড়ের পরিচয়টা কৌশলগতভাবে পাশ কাটিয়ে চলেন। মেয়ে লায়েকা বশির তাঁর সাহিত্যিক পিতা বশির আল হেলালের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, 'আব্বা আমাদের

বাড়ি কোথায়? কেউ জানতে চাইলে কী বলবো—মুর্শিদাবাদ না ঢাকা?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'দ্যাখো মা, আমার জন্ম মুর্শিদাবাদে ঠিকই, কিন্তু তোমার তো ঢাকায় জন্ম, এটাই তোমার জন্মভূমি।'

জন্মভূমির মায়া ভুলে থাকা মুখের কথা নয়। বাংলাদেশের প্রখ্যাত নাট্য অভিনেতা আবুল হায়াৎ সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "তখনও ঠিক বোঝার মতো বয়স আমার হয়নি, তিন - বছর হবে। আব্বা রেলে চাকরি করতেন। একদিন দেখি হঠাৎ আব্বা পালকি করে আমাদের গ্রাম থেকে (মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দির জজান) কয়েক মাইল পথ পেরিয়ে সালার স্টেশনে নিয়ে গেলেন। স্টেশনে মানুষ থিক থিক করছে, কোথাও দাঁড়ানোর জায়গা নেই। তারপরের ঘটনা ঠিক আর মনে নেই, অতঃপর আমরা চট্টগ্রাম রেলওয়ে কলোনিতে পৌঁছে গেছি।.. জীবনের বেলাভূমিতে কয়েকবার বাপ দাদার ভিটে-মাটি ঘুরে এসেছি। আমার দাদাজী ভিটে ছেড়ে কোথাও যেতে রাজি হননি... আজ তাঁরা মহাকালে সব হারিয়ে গেছেন, আমরা তাঁর কবর জিয়ারত করেছি, নিজের হাতে আমার পূর্ব পুরুষদের দেশের মাটির গন্ধ আকড়ে থেকেছি। চোখের পানিকে বাগ মানাতে পারিনি। সেই মায়া, সেই মাটির সুবাস! জীবনে নতুন করে আমার চাওয়া পাওয়ার আর কিছু নেই। শুধু একটা কথাই মনে হয়, আজ সত্তর বছর আগে ইতিহাসে দেশভাগের নামে যা ঘটেছিল তা নাহলেও পারতো।" আমাদের অজানা এমন কত মানুষই যে দেশভাগের কারণে ভিটে ছেড়েছেন তার কোনো পরিসংখ্যান নেই।শুধু বলা হয় দেশভাগের পর ওপার থেকে কয়েক দশকে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ এপারে,আর এপার থেকে আট-দশ লক্ষ ওপারে চলে গেছেন। দুটি ক্ষেত্রেই সরকারি পরিসংখ্যানের হিসেবে গোলমাল আছে।

অতপর আমরা চট্টগ্রাম রেলওয়ে কলোনিতে পৌঁছে গেছি।.. জীবনের বেলাভূমিতে কয়েকবার বাপ দাদার ভিটে-মাটি ঘুরে এসেছি। আমার দাদাজী ভিটে ছেড়ে কোথাও যেতে রাজি হননি... আজ তাঁরা মহাকালে সব হারিয়ে গেছেন, আমরা তাঁর কবর জিয়ারত করেছি, নিজের হাতে আমার পূর্ব পুরুষদের দেশের মাটির গন্ধ আকড়ে থেকেছি। চোখের পানিকে বাগ মানাতে পারিনি। সেই মায়া, সেই মাটির সুবাস! জীবনে নতুন করে আমার চাওয়া পাওয়ার আর কিছু নেই। শুধু একটা কথাই মনে হয়, আজ সত্তর বছর আগে ইতিহাসে দেশভাগের নামে যা ঘটেছিল তা নাহলেও পারতো।

দেশভাগের ইতিহাস পড়ে আমার একটা দৃঢ় ধারণা তৈরি হয়েছে যে, বেশিরভাগ মানুষ যারা শহরতলি বা গ্রামাঞ্চল থেকে পূর্ব পাকিস্তানে গেছেন তাঁদের দেশত্যাগের পশ্চাতে ভয়ঙ্কর কোনো হিংসা বা নিপীড়নের বিষয় নেই। সদ্য প্রতিষ্ঠিত মুসলিম অধ্যুষিত দেশে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ সুযোগ এপারের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানদের অনেকাংশকে প্রলোভিত করেছে সন্দেহ নেই। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সচেতন শ্রেণির পক্ষে এই সুযোগ থেকে মুখ ফেরানো খুব সহজ ছিল না। আবার পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভবিষ্যত নিয়ে অনেকেই দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে অনিশ্চয়তার দিকে পা বাড়াননি বা অপেক্ষা করেছেন যে বিপজ্জনক প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি না হলে সাত পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে ওপারে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কৃষিজীবী এমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, এপারের শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানেরাও ওপারের সংস্কৃতি, ভৌগোলিক অবস্থান, যাতায়াত যোগাযোগ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাই এপারের শহুরে বাঙালি মুসলমান যারা হিংসার শিকার হন, ভাগ্যান্বেষী শিক্ষিত মুসলমান, সীমান্ত এলাকার সাধারণ মুসলমানরা ওপারে চলে গেলেন। আমার নানাশ্বশুর বশির মণ্ডল নদীয়া জেলার কালিগঞ্জ থানার মানুষ। তাঁর বাড়ি থেকে তেহট্ট, মেহেরপুর খুব দূরে ছিল না;

মেহেরপুর-কালিগঞ্জ রোডের মাঝামাঝি ছোটচাঁদ ঘরে বাড়ি। উনি পেশায় স্কুল শিক্ষক ছিলেন, প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক, পুকুর পুষ্কুরিণি বাগান সবই ছিল। মামলা মকদ্দমা তখনও ঝুলে ছিল মেহেরপুর কোর্টে। দেশভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাবেন কিনা তা নিয়ে চরম মানসিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল তাঁর মধ্যে; কিছুতেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। বশির সাহেবের বড় ভাই সলিম সাহেব লেখাপড়া তেমন জানতেন না, কিন্তু ভীষণ সাহসী, উদ্যমী, প্রভাবশালী মানুষ ছিলেন। তিনি ছোট ভাইকে জানিয়ে দিলেন, তাঁর পক্ষে দেশের মায়া মমতা ত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে যাওয়া সম্ভব নয়। কপালে যা আছে তাই হবে। ফলে তাঁদের পরিবারের আর দেশছাড়ার দরকার হয়নি। সলিম সাহেবদের মতো প্রভাবশালী জোতদার মানুষদের দৃঢ়তার জন্য গ্রাম অঞ্চলের বহু বাঙালি মুসলমান ওপারে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। আমার গ্রামের কিছু শিক্ষিত ও জোতদার পরিবার দেশছেড়ে যেতে চাইলে কালিগঞ্জের বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ হিন্দুরা বাধা হয়ে দাঁড়ান। তাঁরা যেকোনো উদ্ভূত বিপদ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহানুভবতা দেখিয়েছেন। ঠিক একইভাবে সীমান্তের এপার-ওপারে ঘটে যাওয়া এমন অজস্র উদাহরণ আছে যেগুলি হয়তো ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ঠাঁই পায়নি। প্রতিবেশীকে অভয় দিয়ে কাছে টেনে আনার ঘটনা প্রমাণ করে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ সাধারণ মানুষের কাছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ছিল না। বলা যায় দেশভাগের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণে এই সব সাধারণ মানুষ অথৈ জলে পড়েন। পার্টিশনে এপারের বিশেষ বিশেষ কয়েকটি শহুরে মুসলমানদের বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কলকাতা, বারাসাত, হাওড়া,হুগলি, বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, মালদা, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার শহরের মুসলমানরা দেশভাগের পরপরই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হন। বহু ক্ষেত্রে অগ্নিসংযোগ, হুমকি, খুনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করে দেশ ছেড়েছে মানুষ। পার্টিশনের পর লীগের প্রভাব এপারে আর কাজে আসেনি। সাধারণ মুসলমানের জীবন ও নিরাপত্তার জন্য জাতীয় কংগ্রেস ও ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির প্রতি নিরঙ্কুশ আস্থা রাখা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। সেই ট্র্যাডিশন এপারে আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

৩

মাজহারুল হান্নান সাহেবরা ওপারে চলে যান পার্টিশনের সময়। গোরাবাজারে গুড়িমহল এলাকার বর্ধিষ্ণু পরিবারের মানুষ তাঁরা। কুমার হোস্টেলের ঠিক পিছনেই ছিল তাঁদের সুবিশাল অট্টালিকা, আজও অবিকৃত অবস্থায় ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিনের বহুমাত্রিক পরিচয়ে পরিচিত তাঁদের পরিবারকে সবাই চিনতেন এক কথায়। হান্নান সাহেবের পিতা শাহ মহম্মদরা ছিলেন তিন ভাই যথা ; গোলাম রসুল , দোস্ত মহম্মদ, শাহ মহম্মদ। এঁদের মধ্যে শাহ মহম্মদ ও দোস্ত মহম্মদ ছিলেন বহরমপুর জজ কোর্টের স্টেনোগ্রাফার ও রেকর্ড কিপার। বড়ো ভাই গোলাম রসূল লঘু সংগীতের প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। এছাড়াও তিনি খাগড়া অঞ্চলে সিভিল সার্ভিসের বড়ো রেশন ডিলার ছিলেন। পরিবারের সমস্ত খ্যাতিকে ছাপিয়ে গিয়েছেন তাঁর পুত্র তথা ধ্রুপদী রাগ সংগীত শিল্পী ওস্তাদ ফুল মোহাম্মদ। মাত্র সাড়ে তিন বৎসর (আনুমানিক ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে) বয়সে তাঁর সঙ্গীতের হাতে খড়ি হয় পিতার কাছে। তাঁর পিতা লঘু গান করতেন। তিনি পুত্রের কণ্ঠকে রাগ সঙ্গীতের উপযোগী বিবেচনা করে ‘কাশিমবাজার রাজবাড়ি স্টেটের পাখোয়াজ শিল্পী মেঘবাবু, ওস্তাদ কাদের বক্স-এর কাছে উচ্চতর শিক্ষার জন্য পাঠান। ১৯৩৮-১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি অল বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনে ৬টি বিষয়ে অংশগ্রহণ করে ৪টিতে প্রথম এবং দুটিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ মিউজিক কম্পিটিশনে তিনি রাগসঙ্গীতে প্রথম এবং গজলে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। এই সময় কাজী নজরুল ইসলামের সাথে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। ১৯৪০-১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় খেয়াল, ঠুমরী, গজল ও ভজনে পর পর দুই বছর প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলোর ভিতরে আন্তঃকলেজ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় তিনি খেয়াল ও গজলে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগের পূর্ব-কাল পর্যন্ত তিনি তাঁর কাছে রাগ সঙ্গীতের তালিম নেন। দেশ বিভাজনের কিছু আগে তিনি সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে চাকুরি নেন এবং জরিনা বেগমকে বিবাহ করেন। এই সময় তাঁর সকল আত্মীয় স্বজন বহরমপুরেই

থেকে যান। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় এসে তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। এই সময় শিল্পী হিসেবে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সাথে যুক্ত হন। তিনি বেশ কিছু দিন রেডিও এবং টেলিভিশনে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং নজরুল সঙ্গীতের সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি অসংখ্য সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে নজরুল একাডেমীর অধ্যক্ষ শেখ লুৎফর রহমান মৃত্যুবরণ করলে, ফুল মোহম্মদ এই একাডেমীর অধ্যক্ষ হন।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ছায়ানট বিদ্যায়তনের রাগ সঙ্গীতের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এই প্রতিষ্ঠানে তিনি আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হলে, তিনি প্রতিষ্ঠানের উপাধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। এছাড়া শিল্পকলা একাডেমীর উচ্চতর প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষক হিসেবে বহু বছর যুক্ত ছিলেন। আঞ্জুয়ারা, শাহনাজ, ফিরোজা বেগম এর মতো কৃতি শিল্পীদের সঙ্গীতে তালিম দিয়েছেন। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে একুশে পদক পান। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

হান্নান সাহেবের বড়ো ভাই মোহাম্মদ মোজাহারুল ইসলাম বিজ্ঞানের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া সম্পূর্ণ করেন। নাসাতে এটোমিক এনার্জি নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণার কাজে যুক্ত ছিলেন। তিনি বলতেন, আর্থিক অভাবের জন্য কোনেত্রা মেধাকে ঠেকানো যায় না। মেধাবীরা হাজারো বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে জীবনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। লেখাপড়ার প্রতি ছিল তাঁর আজন্ম অনুরাগ। ২০১১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর আগে তিনি গরীব মেধাবী ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য মোটা অঙ্কের অর্থ ব্যয় করার ওসিয়ত করে যান। বর্তমানে হান্নান সাহেব প্রতিবছর প্রফেসর মোহাম্মদ মোজাহারুল ইসলাম স্মারক বক্তৃতা, বৃত্তিপ্রদান অনুষ্ঠান করে থাকেন; খুলনায়।

মাতৃকুলের দিক থেকে হান্নান সাহেবের পারিবারিক সম্ভ্রম ও ইতিহাস ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নদীয়া জেলার প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী কাজী আব্দুল মান্নান ও কাজী মহসিন রেজা তাঁর নিজের মাতুল, পরে মান্নান সাহেবের ৩য় কন্যা নূরজুমা খাতুনের সঙ্গে বিবাহ হয় তাঁর। হান্নান সাহেবের মাতামহ কাজী নজির হোসেন ছিলেন রানাঘাটের প্রখ্যাত জমিদার পালচৌধুরী স্টেটের মূখ্য হিসাব রক্ষক। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে কাজী আব্দুল মান্নান দীর্ঘ চৌদ্দ বছর জেলে ছিলেন। কাজী আব্দুল মান্নান, কাজী মহসিন ওরফে রাজা মিয়া দেশভাগের পর এপারে থেকে যান। অবিভক্ত নদীয়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁদের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

৩

সন্ধ্যার নামাজ শেষে আমাদের এক নিবিড় আলাপচারিতা শুরু হলো—চা,পনির ভেজ, স্ন্যাক্স দিয়ে। উঠে এসেছিল নিজেদের পরিবারের কথা, দু-পারের সমাজ, ধর্ম, ইতিহাসের এমন নানা উপাদানসমূহ। মিসেস হান্নান বেশ বিনয়ী স্বভাবসুলভ, মিশুকে আধুনিক মহিলা; রূপে গুণে প্রশংসাযোগ্য। প্রফেসর হান্নানের সঙ্গে কথা শুরু হয়েছিল দেশ হারানো মানুষদের নিয়ে। কারণ উনি নিজে শৈশবে এই শহরে ভিটে হারিয়েছেন। আমি শুরু করেছিলাম, উনি বেদনার্ত মনে তার ইতি টেনেছিলেন। সেইসব দিনের কতই যে অগণন টুকরো স্মৃতির কোলাজ নিজের অন্তরে বহন করে আসছেন সে কথা জানতে চাইনি আমি। আশি ছুঁই ছুঁই মাঝারি উচ্চতার উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণের দুহারা নিরেট চেহারার হাস্যোজ্জল মানুষটির মুখমণ্ডল জুড়ে এক নূরানী ঝলক ফুটে আসছিল যেন। ভ্রমণ পিপাসু হান্নান সাহেব ইতিমধ্যে অর্ধেক পৃথিবী ঘুরে দেখেছেন, বার্ধক্য এখনও ওনাকে সেভাবে গ্রাস করেনি; চলাফেরায় যথেষ্ট পরিপাটি। হোটেলের বড় ডাইনিং হলের চেয়ারে আমরা পরস্পরের মুখোমুখি তখন, অনেকটা ইতস্তত হয়েই প্রশ্ন করেছিলাম—'মনে পড়ে সেদিনের হারিয়ে যাওয়া এই শহরের দিনগুলি কথা?'

একটু নীরব হয়ে গেলেন তিনি, অতঃপর বলেই চললেন! 'মনে পড়ে সেই ছোট্টবেলার কথা যখন বোঝার মত আমার বয়স হয়নি ঠিকমত। আমার বয়স কত আর হবে চার- পাঁচ বছর হয়তো। আমরা থাকতাম গোরা বাজারের কুমার হোস্টেলের ঠিক পেছনের কোণের বাড়িতে। একটা কথা আমার বেশ মনে আছে, সেদিন ছিল ঈদের দিন, বাড়িতে ছোটরা ঈদের আনন্দে মেতে উঠেছিলাম, এই আনন্দের হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে বড়রা আলোচনা করছিল আমাদের দেশ

স্বাধীন হয়েছিল, ডি এম সাহেব পাকিস্তানের ঝান্ডা তুলেছেন। হিন্দুস্তান-পাকিস্তান কি তা আমার বোধগম্যতার অতীত ছিল। আরও একটা কথা বলা দরকার, শহরে এই আনন্দের ঢেউ থামতে সময় লাগেনি। তিনদিন পরে মুর্শিদাবাদ পুনরায় ভারতে এলো। মার কাছে পরে শুনেছি গোটা শহর জুড়ে বন্দেমাতরম, ঢাক, ঢোল পটকার আওয়াজে ভিতরটা শুকিয়ে গেল। এক অনিশ্চিত দুর্গতি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাদের মতো অসংখ্যক অসহায় মানুষকে সেই ভীতি রাতারাতি গ্রাস করেছিল। সেদিন আমরা ছিলাম পাড়ার সম্পন্ন মানুষ, সমাজে যথেষ্ট নামডাক ছিল আমাদের। অবশেষে একদিন অপেক্ষার প্রহরগোনা শেষ হল, তখন আমরা আত্মীয়, পরিজন ভিটেমাটি ছেড়ে সুদূর খুলনায়। শেষের কথাগুলি বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠস্বর যেন জড়িয়ে আসছিল। স্মৃতি যে সর্বদা সুখের হয় না তাঁর ভেজা কণ্ঠস্বরেই টের পাচ্ছিলাম। ঠিক তারই মাঝে তাঁর স্ত্রী একবার বললেন, 'তুমি তো একবার দূর থেকেও বাড়িটা দেখে আসতে পারতে?' উনি বিরক্ত হয়ে বললেন—'তার আর কী প্রয়োজন আছে! কী আছে আর সেখানে! সেদিন দেশহারানো মানুষের কাছে এত কথা জানতে চেয়ে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছিল। দু'পারে হান্নান সাহেবদের মত দেশ হারিয়েছেন যাঁরা, তাঁদের কোন অপরাধ ছিল না; ইতিহাস তার বড় প্রমাণ। দেশভাগের ফলে পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় কয়েক কোটি মানুষকে উদ্বাস্তু হতে হয়েছে, স্বজন হারিয়েছেন অনেকে। আমাদের মা বোনদের ধর্ষণের শিকার হতে হয়েছে। দেশভাগ তাই লজ্জার, নিরানন্দের, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। লীগ বা কংগ্রেসের বেশিরভাগ নেতা কর্তৃক দেশভাগের এই হাহাকারময় আসন্ন বিপদের কথা জেনেও কোটি কোটি মানুষকে সম্ভাব্য সংকটের মুখোমুখি ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল সেদিন।

৪

গল্পে গল্পে মধ্যরাত গড়িয়ে আসার আগেই আমি তাঁদের দাওয়াত দিয়ে বললাম —' আপনারা প্রস্তুতি সেরে রাখবেন, ঠিক ন'টার সময় আপনাদের নিতে আসব।' পরের দিন বড়ো দুটো মিষ্টির প্যাকেট হাতে আমার বাড়ি এসেছিলেন। আমার স্ত্রী তাঁদের দেশি মুরগির ঝোল, পাবদা, ডাল, ভর্তা, ভাজা দিয়ে আপ্যায়ন করলো। সামান্য আয়োজন, তাঁরা খুবই তৃপ্তিভরে খেয়েছিলেন দেখে খুশি হয়েছিলাম। আসলে এই শহরের সঙ্গে তাঁদের অন্তর-আত্মার যোগ আছে, তাই আমার মতো একজন নগণ্য ব্যক্তির নেমন্তন্নকে উপেক্ষা করতে পারেননি। মোহাম্মদ মাজহারুল হান্নান সাহেব বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত ইতিহাসের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ট্রেজারার।

লেখাপড়ার সূত্রপাত খুলনার সেন্ট যোসেফ হাই স্কুলে। তারপর একে একে খুলনার সরকারি বি এল কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর ইতিহাস বিভাগ থেকে সাম্মানিক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। খুলনার সোহরাওয়ার্দী কলেজে প্রায় ৩৮ বছর অধ্যক্ষ হিসেবে ছিলেন। ইতিহাস চর্চার পাশাপাশি শিক্ষক, কর্মচারীদের সামাজিক ও পেশাগত আন্দোলন সহ বহুমুখী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত আছেন তিনি। ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের বাৎসরিক সভা সমিতিতে বহুবছর ধরে যোগদান করে আসছেন, অসংখ্য গবেষণাধর্মীর লেখনী উপস্থাপন করেছেন এই বর্ষীয়ান গবেষক। ভাবতে অবাক লাগে, এমন একজন অধ্যাপক সুদূর ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে আসছেন শুধু পেপার প্রেজেন্টেশন করতে। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের কর্মকর্তারা এই প্রবীণ অধ্যাপককে কোনো একটা সেশনের চেয়ার করার সম্মানজনক প্রস্তাব দিতে পারেন না। কলকাতার এই 'ভদ্রলোকশ্রেণীর' আচরণ লজ্জাজনক।

প্রফেসর হান্নান সাহেব পলাশ বিশ্বাস নামে দক্ষিণ কলকাতার এক তরুণ সুদর্শন যুবকের কথা অসংখ্যবার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করলেন—তাঁর অমায়িক ব্যবহার, আতিথিয়তা কোনদিন ভুলতে পারবেন না বলে জানিয়ে গেলেন। জীবনের বেলাভূমিতে চাওয়া পাওয়ার মতো আর কিছু নেই। যা হারিয়েছি তা নিয়ে ভাবতে চাই না, যা পেয়েছি তা প্রত্যাশার অতীত। আজ শুধু একটাই আফসোস, কেন যে এভাবে দেশটা ভাগ হলো কে জানে। যখন নিজের জন্মভূমির মাটি স্পর্শ করতে পাসপোর্ট-ভিসার জন্য লাইনে দাঁড়াতে হয় তখন নিজেকে প্রবোধ দেওয়ার কোনো ভাষা থাকে না!

হান্নান সাহেবদের মত অসংখ্য মানুষকে শিকড়ের স্মৃতি খুঁজতে এপার থেকে ওপারে, ওপার থেকে এপারে যাতায়াত করতে হয় নিত্যদিন; ইতিহাসে সেভাবে লেখা হয় না তার কথা।

বিলকিস বানো এবং কিছু প্রশ্ন

শফিকুল হক

(আমরা যারা এখনো শুভচেতনার দীপ শেষাবধি প্রজ্জ্বলিত থাকার ব্যাপারে চূড়ান্ত আশাবাদী নিঃসন্দেহে তাদেরকে জোর ধাক্কা দিয়েছে বিলকিস বানু সংশ্লিষ্ট বৃত্তান্ত। এর থেকে অমানবিক দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে! কিন্তু কেন; কেন এমন অমানবিকতার উদ্বোধন? নিজস্ব চিন্তনের গভীরে ডুব দিয়েছেন লেখক)

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি মহোৎসবের দিনে একটা টুকরো ঘটনার খবর মিডিয়া মারফত জানা গেল—বিলকিস বানোর গণধর্ষণকারী সাজাপ্রাপ্ত ১১ জনকে জেল থেকে আগাম মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এবং এখন দেশের প্রায় সর্বশক্তিমান চালক সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তাদের নিজস্ব অফিসে সেই ১১ জনকে বিজয় গৌরবের মালা পরিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করেছে।

এমন তো কতই হয়!

আমাদের দেশে এ আর নতুন কথা কী? এমন ঘটনা তো ঘটেই থাকে —গড়পড়তা মানুষের এটাই প্রতিক্রিয়া। এবং হ্যাঁ, হিন্দু কিংবা মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের অধিকাংশ জনেরই এইরকম মনোভাব। কারণ এখন এইসব দৃশ্য দেখে আর বিস্ময় জাগে না, একপ্রকার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। তবুও সোশ্যাল মিডিয়া সহ বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং সংবাদপত্রে খবরটি উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্ন রকম ফোকাস দিয়ে। যেমন —'ধর্ষকদের ফুলের মালা দিয়ে সংবর্ধনা: প্রধানমন্ত্রী নীরব কেন?' 'স্বাধীনতা দিবসের ৭৫ বছর পূর্তিতে নারী জাতির অপমান', 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নারী বিদ্বেষী আচরণ : কোনও প্রতিবাদ নেই' ইত্যাদি। ফেসবুকে উদার এবং প্রগতিমনস্ক মানুষজনের কিছু ধারালো মন্তব্য পোস্ট হতে দেখা যাচ্ছে। যেমন --- 'এই হচ্ছে বিজেপির মুখ ও মুখোশ', 'প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা দিবসের বক্তৃতায় হিংসার বিরুদ্ধে কথা বলছেন, নারীর সম্মানের কথা বলছেন, অথচ আদালতে সাম্প্রদায়িক হিংসা, হত্যাকাণ্ড এবং গণধর্ষণের অভিযোগে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের গুজরাট সরকার মুক্তি দিয়ে দিল—তারই দলের লোকজন ওদের বিজয়মাল্য পরিয়ে দিল। কী বীভৎস, কী অমানবিক এই রাষ্ট্রশক্তির

নীতি' ইত্যাদি। কিছু মুসলিম পরিচিত চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব ফেসবুকে দীর্ঘ পোস্ট দিয়ে তুলে ধরেছেন —কী হিংস্র, কী বর্বরোচিত অমানবিক এই আচরণ! অথচ আমাদের রাষ্ট্রশক্তি এই অন্যায় অমানবিকতাকে উৎসাহিত করে চলেছে। এদেশে মুসলিমরা ক্রমশ বিপজ্জনক জায়গায় চলে যাচ্ছে, আমাদের এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে ইত্যাদি।

শুধু বিলকিস বানো কেন, এদেশে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অন্যায় অত্যাচার, যেমন—পিটিয়ে মেরে ফেলা, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা, বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, সংবাদ সংগ্রহের জন্য সাংবাদিককে অকারণে জেলে ঢুকিয়ে রাখা, বুলডোজার চালানো—হরহামেশা এসব খবর মিডিয়াতে আসে, আর মানুষের গড়পড়তা প্রতিক্রিয়া কাগজে টিভিতে ফেসবুকে এরকমই হয়ে থাকে। প্রশ্ন হলো—এসব তো আমরা সবাই জানি। হতাশ, বিবর্ণ, আতঙ্কিত চোখ নিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া আমাদের কীইবা করার আছে? কীইবা করতে পারি?

কিছু করার আছে কিনা, বা আদৌ কী কী করা সম্ভব সেসব বিচার বিশ্লেষণ প্রগতিমনস্ক, শুভবোধে উদ্দীপিত সমাজবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং নেতৃবৃন্দের কাজ। এই লেখায় আমরা শুধু একটা মাত্র দিকে দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ করব যে—যেসব মানুষজন সাড়ম্বরে প্রকাশ্যে ১১ জন খুনি ধর্ষককে বিজয়মাল্য পরিয়ে গৌরবান্বিত করল, তারা কি সবাই মূর্খ? অশিক্ষিত? বাজে চরিত্রের বিচ্ছিরি লোক? ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে এই মানুষগুলো কি ক্রিমিনাল চরিত্রের? হিংস্র ঠকবাজ অসামাজিক? এসব প্রশ্নের উত্তর আমরা জানি না, জানার দরকারও হয়নি। কিন্তু আমার মনে হয় এই তথ্যগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এই প্রশ্নের উত্তরগুলি সন্ধান করা খুবই জরুরী —বিশেষত আজকের এই দিশেহারা সংকটকালে।

যে এগারোজন মানুষ বিলকিস বানোর পরিবারের লোকজনকে বিচ্ছিরি রকমের নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল (নিশ্চয় ভদ্রভাবে গুলি করে কিংবা যাতে ব্যথা কম হয় সেজন্য তরোয়ালের এক কোপে শিরশ্ছেদ করেনি), তিন বছরের শিশুকে অকল্পনীয় ভাবে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলেছিল (এসব কথা আদালতে প্রমাণিত) এবং সর্বশেষে চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ, চাপ চাপ রক্ত, থ্যাতলানো শিশুর বিকৃত দলা পাকানো দেহ—এরকম দৃশ্যের ভিতর সবাই কাপড়-চোপড় খুলে বীভৎসতার যন্ত্রণায় প্রায় অজ্ঞান, শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া একটা নগ্ন নারীদেহের উপর যৌনতার আবেগে যারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল— তারা কি গড়পড়তা আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের চেয়ে একেবারেই আলাদা? যতই নৃশংস নির্মম পাশবিক চরিত্রের হোক, এইরকম একটা রক্ত মাখা মৃতদেহ ছড়ানো দৃশ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটি মানুষ যৌন আবেগে উত্তেজিত হতে পারে? মানুষের শারীরিক ও স্নায়বিক বিজ্ঞান কি এই জৈবিক প্রক্রিয়াকে সম্ভব বলে স্বীকার করে? তারপরেও মনোবিদদের ভাবনার খোরাক হওয়া উচিত— বিচ্ছিরি পরিবেশেও একজন আকর্ষণীয়া নারীকে একেবারে অসহায় অবস্থায় হাতের মধ্যে পেলে, আশেপাশে কেউ না থাকলে, একা একজন পুরুষের যৌন লোভ জাগ্রত হতেই পারে। কিন্তু আশেপাশে আরো মানুষ থাকলে তাদের সামনে বাসনা জাগলেও যৌনতায় লিপ্ত হওয়া ভীষণ রকমের অস্বাভাবিক, অন্তত বিকৃতকামী না হলে। কিন্তু এতোরকম অস্বাভাবিকতাই এখানে ঘটেছে। প্রশ্ন তো জাগাই স্বাভাবিক —এইরকম পরিবেশে কিছু সাধারণ মানুষের মধ্যে এরকম অদ্ভুত প্রবৃত্তি জাগলো কী করে? ব্যক্তি জীবনে এই ১১ জন কি খুবই লম্পট প্রকৃতির? শিশুদের উপর মায়া-দয়া নাই! এতটাই তারা খুনি নৃশংস প্রকৃতির? তারা কি গুজরাটের আর পাঁচটা মানুষের থেকে এতোটাই আলাদা চরিত্রের?

এ বিষয়ে কোনো তথ্য পরিসংখ্যান নেই। কোনো বিশ্লেষণধর্মী লেখাজোখাও চোখে পড়েনি। সুতরাং ১০০ ভাগ জোর দিয়ে কিছু বলা মুশকিল। কিন্তু আমার ধারণা, অনুমানে প্রায় সকলেই একমত হবেন যে — দু'একটা ব্যতিক্রম হতে পারে, কিন্তু এই মানুষগুলো ব্যক্তি জীবনে সবাই আদৌ নৃশংস খুনি প্রকৃতির নয়। আদৌ কামুক লম্পট চরিত্রের নয়। এমনও হতে পারে এদের কারো কারো সেবামূলক কাজকর্মে নাম আছে, পাড়ায় প্রতিবেশীর বিপদে আপদে ছুটে যায়। নিজেদের ও পড়শীদের শিশুদের তারা যথেষ্ট ভালোবাসে, আদর করে, কেউ চড় থাপ্পড় মারলে তার প্রতিবাদ করে। সামাজিক জীবনে এরা হয়তো নারীর মর্যাদা নিয়ে আন্তরিকভাবেই সোচ্চার হয়। সঙ্ঘবদ্ধভাবে তো দূরের কথা—একাও হয়তো কখনো কোনও নারীর হাত ধরে টানেনি, যৌন হেনস্থা করেনি। তাহলে? প্রশ্ন জাগে না—বিলকিস বানোর বাড়িতে তারা এরকম হয়ে গেল কেন? প্রশ্ন যে একেবারে জাগে না এটা ভাবতে অবিশ্বাস্য লাগে। ভিতরে ভিতরে নিশ্চয়ই জাগে, কিন্তু না কোনও

মননশীল ম্যাগাজিনে, কোনও টিভির আলোচনায়, এমনকি ফেসবুকের মত স্বাধীন খোলা মাধ্যমেও এসব প্রশ্ন বিশেষ আলোচিত হতে দেখি না।

ঠিক একইরকম ভাবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতো বিশ্বব্যাপী একটা মতাদর্শ নিয়ে ছড়িয়ে থাকা যথেষ্ট প্রাচীন একটি সংগঠনের মানুষজন যখন আগ্রহ ভ'রে, সাড়ম্বরে সেই ধর্ষক খুনি ১১ জনকে মালা দিয়ে সম্বর্ধনা দেয় — তখন কি মনে হয় না, যে এই সংগঠনের নেতৃস্থানীয় মানুষজন সবাই এই ধর্ষক ও খুনিদের বরমাল্য পরিয়ে দেওয়াকে সমর্থন করে? অর্থাৎ সনাতন ভারতবর্ষের একটা বিরাট সংগঠনের বিশাল সংখ্যক মানুষ নৃশংস হত্যাকে সমর্থন করে, নিরাপরাধ একটা শিশুকে আছড়ে মারাটাকে দোষের কিছু মনে করে না, দল বেঁধে উলঙ্গ হয়ে নিস্পন্দ হয়ে যাওয়া একজন গৃহবধূকে সমবেত আক্রমণ করে, বিচ্ছিরিভাবে ধর্ষণ করাকে জায়েজ শুধু নয়, রীতিমতো বীরত্বের কাজ বলে মনে করে? এর প্রতিক্রিয়ায় সাধারণভাবে আমার আপনার মনে কী উদয় হবে? এই লোকগুলো সবাই দুশ্চরিত্র, অমানুষ। মনুষ্যত্ব বলে এদের কিছু নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্রোধ এবং বিবমিষা সামান্য সময় সরিয়ে রেখে একবার যদি ভাবি—সত্যিই কি তাই? দেশ এবং বিদেশ জুড়ে বহু কোটি মানুষ একসঙ্গে এরকম অমানুষ হতে পারে? সেটি বাস্তবসম্মত?

না ভাই, এক্ষুণি মাথা গরম করে পাল্টা যুক্তি দেবেন না। একটু ধৈর্য ধরুন, একটু মাথা ঠান্ডা করে ভাবুন। মনে করুন আপনি এই শ্রেণির মানব গোষ্ঠীর 'হিউমান সাইকোলজি' বা 'গণ-নৃশংসতা' এরকম একটা বিষয় নিয়ে স্টাডি করছেন। তথ্য সংগ্রহ করলে কী মনে হয়—কোটি কোটি মানুষকে এরকম নৃশংস, ধর্ষক, নারকীয় অত্যাচারী এবং এইসব অমানবিক অপরাধীদের নিয়ে গৌরব অনুভবকারী হিসেবে আমরা দেখতে পাবো? এরকম সার্ভে যেহেতু কেউ করেনি, সেইহেতু কূট তর্ক থেকেই যাবে। আমাদের সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি মতে উক্ত স্টাডি গিয়ে এইরকম একটা উপসংহারে পৌঁছাবে—বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কিংবা অনুরূপ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির অনুসারী বহু লক্ষ, হয়তো বা বহু কোটি মানুষ এই দেশে আছে যারা ব্যক্তি-জীবনে, সমাজ-জীবনে যথেষ্ট পরোপকারী, যথেষ্ট ভদ্র, সভ্য, অন্যের প্রতি সহমর্মী, নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল—একমাত্র তারা যদি মুসলমান বা নিচু বর্ণের দলিত না হয়। দলিতদের তবু লাথিঝাঁটা দিয়ে দূর ছাই করেও নিম্ন শ্রেণির মানব বলে মান্য করা চলে, কিন্তু মুসলমান হলে তাদের প্রতি সেইসব ভদ্রতা সভ্যতা মানবিকতা প্রযোজ্য হবে না। তাদের একেবারেই মনুষ্য পর্যায়ে ফেলা যায় না। শুধু সেখানেই শেষ নয়— মুসলমানরা মানুষ তো নয়ই, পশু হিসাবেও তাদের গরু মহিষ ছাগল বিড়ালের মতো নিরীহ প্রজাতির দলে ফেলা যায় না। গরু-ছাগলের উপর অত্যাচার করলে মায়া-মমতা জাগে, তারা বাড়িতে, উঠোনে বা আশেপাশে ঘুরে বেড়ালে কোনরকম অস্বস্তি বা বিরক্তি উৎপাদন করে না। কিন্তু মুসলমান নামক সম্প্রদায়ের লোকজনকে তারা কেঁচো, ছুঁচো, ব্যাঙ, গিরগিটি প্রভৃতি 'এ:, ম্যাগো!' টাইপের ঘৃণিত জীব বলে মনে করেন। একটা আরশোলা উল্টে গিয়ে সারারাত ছটফট করলে তা দেখে আমরা বেশ মজাই পাই। খাটের তলায় ইঁদুরের বাচ্চা দেখতে পেলে আমরা কী করি? যা করেই হোক তাকে থেতলে মেরে দিতে না পারলে স্বস্তি পাই না। নচ্ছার ওই বাচ্চাগুলো তো বড় হয়ে ঘরের লেপ-তোষক সব কাটবে! বিলকিসের তিন বছরের বাচ্চাটি তাদের চোখে ঐরকম ভবিষ্যতের ক্ষতিকারক ইঁদুর শাবক, ওকে আছাড় দিয়ে মারাতেই সাফল্য। এবং উপসংহারের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কথা—ব্যক্তিগতভাবে বিসমিল্লা খান, বড়ে গোলাম আলী, মহম্মদ রফি, এপিজে আব্দুল কালাম, শাহরুখ খান, সায়রা বানু, আজহারউদ্দিন এদের অনেকের কাছেই খুব প্রিয়। অনেকেই ব্যক্তিগত স্তরে এদের ফ্যান। কিন্তু

বিলকিস কিংবা আফরাজুল, আখলাক কিংবা আসিফা—এদের পুড়িয়ে মারা, কাতুকুতু দেওয়া, গাছে বেঁধে রাখা, নাড়িভুঁড়ি কেটে দেওয়া—কোনও ঘটনাই এদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। ওরা আবার মানুষ নাকি? ওরা তো মুসলমান! খুব সম্ভবত এই বোধ এই দেশের বহু মানুষের মস্তিষ্কে এবং স্নায়ুতন্ত্রে স্থায়ীভাবে মিশে গিয়েছে।

সম্প্রদায় হিসাবে যখনই মুসলমান শব্দটি কানে আসে, এদের অনেকেরই 'ওয়াকথু' টাইপের বিবমিষা পায়, ঘৃণায় মুখচোখ কেমন হয়ে যায়। সেই কারণেই বিলকিস কিংবা আফরাজুল, আখলাক কিংবা আসিফা—এদের পুড়িয়ে মারা, কাতুকুতু দেওয়া, গাছে বেঁধে রাখা, নাড়িভুঁড়ি কেটে দেওয়া—কোনও ঘটনাই এদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। ওরা আবার মানুষ নাকি? ওরা তো মুসলমান! খুব সম্ভবত এই বোধ এই দেশের বহু মানুষের মস্তিষ্কে এবং স্নায়ুতন্ত্রে স্থায়ীভাবে মিশে গিয়েছে।

ভুল হতে পারে। হতেই পারে এটা একটা মন গড়া ন্যারেটিভ। কিন্তু অন্য কোনও বিকল্প ন্যারেটিভ কি আছে হাতের মাথায়? উপযুক্ত কোনও ব্যাখ্যা? তা যদি না থাকে, তাহলে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে যেসব শুভবোধ সম্পন্ন মানুষজনকে, মানবিক বোধ সম্পন্ন মানুষজনকে, সাম্প্রদায়িকতার ভয়াল অন্ধকারে প্রায় ডুবন্ত একটি দেশ নিয়ে ভীষণভাবে চিন্তাগ্রস্ত মানুষজনকে নতুন করে ভাবতে হবে—কেন এরকম হলো, এর হাত থেকে পরিত্রাণের সত্যিই কার্যকরী বাস্তবসম্মত কোনো উপায় আছে কিনা। নতুন করে ভাবতে বলার কারণ একটাই —একই ব্যাখ্যা, একই ন্যারেটিভ পুনরাবৃত্তি হয়ে চলে আসছে, চলতেই আছে—হিন্দুত্ববাদীরা মূর্খ, মনুবাদী ধর্মান্ধ, তারা এই দেশটাকে হিন্দুরাষ্ট্র বানাতে চায়, সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ ধ্বংস করে দিতে চায়, মুসলমানদের এই দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়, তাড়াতে না পারলে নাগরিকত্বের অধিকারবিহীন হয়ে তথাকথিত শূদ্র বা দাস জাতীয় শ্রেণিভুক্ত করে রাখতে চায় ইত্যাদি। আজও বড়ো বড়ো সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় এবং লিটিল ম্যাগাজিনের তত্ত্বমূলক প্রবন্ধগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই কথাগুলি বলতে থাকে, বলে যেতে থাকে। আর শেষে সেই এক হাহাকার—দেশের মানুষকে বোকা বানানো হচ্ছে, ক্রমাগত মিথ্যে কথা শোনানো হচ্ছে, ইতিহাস বদলে দেওয়া হচ্ছে। হায় হায়! এবার কী হবে? আহত হা-হুতাশ আর হা-হুতাশ। কোথাও কোনও সুস্পষ্ট পথ নির্দেশিকা নেই। শুধু রাষ্ট্রশক্তিকে গালাগালি, নাগপুর আর শাসক দলকে গালাগালি এবং আহ্বান—এবার ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, জেগে উঠতে হবে!

কেন বাপু? এতোকাল কি ঘুমিয়ে ছিলে? থাকলে কেন ঘুমিয়ে ছিলে? আজ হঠাৎ জেগে ওঠার কথা মনে হলো কেন? হিন্দু মহাসভা কিংবা সংঘ পরিবারের লোকজন তো তাদের কথা কোনদিন গোপন করে রাখেনি। একশো বছর আগেই, তখনো পাকিস্তান ভাগ হয়নি, তখনই ভারতবর্ষকে শুধু হিন্দুর দেশ হিসেবে ঘোষণা করেছে তারা। সেই লক্ষ্যে দেশকে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করে তারা তাদের কর্মসূচি নিয়েছে—এবং তারা প্রকাশ্যেই সেসব উদ্যোগ নিয়েছে। হতে পারে অবৈজ্ঞানিক, হতে পারে অমানবিক, হতে পারে আমার অপছন্দের—তাই বলে কিছু মানুষের আদর্শগত একটা সাংগঠনিক মত, একটা কর্মসূচি তো থাকতেই পারে। মুসলমানরা একটা ঘৃণ্য প্রজাতি, তারা আবার গোমাতাকে হত্যা করে, তার মাংস খায় — এতোটাই নীচ! তারা এই দেশে বিষাক্ত কীটের মতো, উপযুক্ত কীটনাশক দিয়ে যত দ্রুত তাদের বিনাশ করা ঘটানো যায় ততই দেশের মঙ্গল—এসব কথা তো তারা খোলা গলায় একশো বছর ধরে বলে আসছে। তা তখন এসব কথা শুনেও নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন কেন? কেন দেশের কোটি কোটি মানুষকে সেই ন্যারেটিভ বিশ্বাস করার সুযোগ করে দিয়েছেন? কেন পাল্টা কোনও ন্যারেটিভ—নানক, কবীর, চৈতন্য, পরমহংস, মানবতা, নরের মধ্যে নারায়ণ, সনাতনী সহনশীলতা, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ —পাল্টা প্রচারের একটা প্রাচীর কেন তুলে ধরতে পারেননি? মুসলমানরা ঘৃণ্য কোনও জীব নয়, তারাও এদেশের স্বাভাবিক সাধারণ জনমানুষ, আর পাঁচজনের মতো তাদেরও প্রেম-প্রীতি, হাসি-কান্না, মায়া-মমতা আছে। চাষবাস, লেখাপড়া, সাহিত্য সংস্কৃতি, গান বাজনা, আমোদ প্রমোদ, শ্রদ্ধা সহমর্মিতা, এমনকি চুরি বাটপাড়ি, লাম্পট্য নোংরামি সবই অন্য সাধারণ পাঁচজন ভারতীয়ের মতো—কেন এই কথা লক্ষ-কোটি সাধারণ মানুষের কাছে ঠিকঠাক পৌঁছায়নি? আমরা কেন সেই বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারিনি? কোথায় আমাদের ত্রুটি ছিল? সেই ত্রুটি কি আজও আমরা বহন করে চলেছি?

সারি সারি প্রশ্ন, কারণ প্রশ্ন করা সহজ কাজ। ঠিক তাই। উত্তরগুলো যদি সহজ হতো তাহলে প্রশ্নগুলোর হয়তো জন্মই হতো না। উত্তর কঠিন বলেই তো প্রশ্নগুলির অবতারণা—যাতে মননশীল মানুষের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগে। অনুসন্ধানের শেষে হয়তো দেখা গেল প্রশ্নগুলোই ভুল। তখন না হয় প্রশ্নগুলি বাতিল বলে ঘোষণা করা হবে। তার আগে প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা হোক, অনুসন্ধান হোক—সেই দাবি আমরা নিশ্চয় করতেই পারি।

বঙ্গীয় সাহিত্যিক অনুসন্ধান সমিতির কথা

এম রুহুল আমিন

(চেতনার জাগরণ এখন সুস্পষ্ট। এ রাজ্যের পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু সমাজের অগ্রগতির লক্ষ্যে ক্রিয়াশীল হয়েছেন বেশ কিছু ব্যক্তি ও সংগঠন। বঙ্গীয় সাহিত্যিক অনুসন্ধান সমিতি তার মধ্যে অন্যতম।)

দেখতে দেখতে আমরা স্বাধীনতার ৭৫টি বছর অতিক্রম করে ফেললাম। কিন্তু দলিত-আদিবাদী-সংখ্যালঘু সমাজের মানুষের শিক্ষা, সাহিত্য, কর্মক্ষেত্রে পশ্চাদপদতা স্বাধীনতার এতো বছর পরেও প্রকট থেকে প্রকটতর! অথচ এই সব প্রান্তিক মানুষের জন্য সেভাবে আওয়াজ উঠছে না। সমাজের জাগ্রত বিবেক হিসেবে পরিচিত বুদ্ধিজীবী সমাজের কণ্ঠস্বর দিন দিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে! দিন দিন এই প্রান্তিক সমাজের মানুষের জীবন জীবিকা সাহিত্য সংস্কৃতি হুমকির মুখে। এখন এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য এই পিছিয়ে থাকা সমাজের মানুষের মধ্যে থেকে আর্থিক ও শিক্ষার দিকে এগিয়ে থাকা অংশকে বেশি করে সোচ্চার হতে হবে। বিশেষ করে কলমচারী জাগ্রত বিবেকদের দায় ও দায়িত্ব বেশি। হ্যাঁ এই পিছিয়ে থাকা সমাজের কবি-সাহিত্যিকরা ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ সোচ্চার; কিন্তু দেয়ালে যখন পিঠ ঠেকে গেছে তখন সম্মিলিত ভাবে প্রতিবাদ যেমন করতে হবে সেই সাথে প্রান্তিক সমাজের সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের উদীয়মান নিভৃতচারীদের অনুসন্ধান করে আগামীর পথকে সুগম করতে হবে। আর এক্ষেত্রে সমাজের এগিয়ে থাকা অংশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য সহযোগিতা একান্ত দরকার। কবি গুরুর কথায়—'যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে/পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।' (গীতাঞ্জলি,১০৮)

দেশভাগের ফলে বাংলা সাহিত্যের আকাশে একটা আঘাত এলেও তা কিছুদিনের মধ্যে মেরামত হয়ে যায়। তাতে অবশ্য ওপার বাংলা থেকে আগত এক বিশাল সংখ্যক সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের উচ্চবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ অবদান ছিল। পাশাপাশি দলিত সমাজের থেকে কিছু নেতৃত্ব উঠে আসার কারণে তাঁরাও সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজ জীবনে কিছুটা নিজেদের মেলে ধরতে পেরেছে। গড়ে উঠেছে আদিবাসী সংস্কৃতি পরিষদ, দলিত সাহিত্য একাডেমী ইত্যাদি। যদিও এই দলিত আদিবাসীদের সমাজচিত্র ও উন্নয়ন এখনো আশানুরূপ নয়। অন্যদিকে দেশভাগজনিত কারণে এপার বাংলার সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের জীবনে আসে এক দিশাহীন অন্ধকারময় পর্ব। তদানীন্তন মুসলিম উচ্চবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের দেশত্যাগের কারণে কলকাতা ও অন্যান্য শহরে মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও উচ্চবিত্তের শূন্যতা সৃষ্টি হয় এবং পক্ষান্তরে সংখ্যাগুরু হিন্দু উচ্চবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এই দেশে ভিটেমাটির টানে রয়ে যাওয়া মুসলমান (যার অধিকাংশ গ্রামে বসবাসকারী কৃষিজীবী ও শ্রমিক শ্রেণির) সম্প্রদায়কে যখন দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন জোগাড় করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তখন তাদের কাছে সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা সোনার পাথরবাটি হয়ে দাঁড়ায়।

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বঞ্চিত এই সমাজ এক প্রান্ত সীমায় পৌঁছে গেছে। এর মাঝে দু'চার জন কবি-সাহিত্যিক একান্ত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সাহিত্যচর্চা করে আসলেও তারা প্রতিষ্ঠিত শিল্প-সাহিত্য গোষ্ঠীগুলিতে তেমন সমাদর পাননি। তবে এর মাঝে আবদুল আজিজ আল আমান ও তাঁর 'জাগরণ', 'কাফেলা', 'নতুন গতি'-র হাত ধরে কিছু সাহিত্যিক উঠে আসেন। সেই সাথে সমসাময়িক কালে কিছু পত্র-পত্রিকা গোষ্ঠী এই পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের থেকে সাহিত্যিক তুলে আনার প্রচেষ্টায় আছেন। তবে তার সংখ্যা

হাতে গোনা। শুধু তাই নয়, সমসাময়িক কালে মুসলিম সাহিত্যিকের লেখা বহুল প্রচারিত গ্রন্থ কই? সেই সাথে মনে উঁকি দেয় আরও প্রশ্ন। এই সমাজে প্রচলিত দু-চারটি সাহিত্য পত্রিকার ছাড়া আর নাম শোনা যায় না কেন?

এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে একসময় এই সমাজের সাহিত্যচর্চার চালচিত্র সম্পর্কে বিশদে জানার আগ্রহ জাগে। সেই থেকে নানান সাহিত্যপ্রেমী মানুষের সঙ্গে কথোপকথন, পড়াশোনা, বইপত্র ঘাটাঘাটি করতে করতে এই সমাজের সাহিত্য চর্চার চালচিত্র সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগৃহীত হলো। সেই ভাবনা থেকে আগস্ট মাসের শেষের দিকে ২৮/০৮/২০২০ ফেসবুক এ নোটিশ দিয়ে ২৯/০৮/২০২০ থেকে ফেসবুকের প্লাটফর্মে 'স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজের সাহিত্যচর্চার চালচিত্র' বিষয় শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা চলতে থাকে। প্রথম পর্ব থেকেই দেখা গেল বিষয়টা নিয়ে অসংখ্য সাহিত্যপ্রেমী মানুষ তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করে কাজটি কে এগিয়ে নিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে চলেছেন। ধারবাহিক ভাবে এই সমাজের স্মরণাগত, সমসাময়িক, উদীয়মান ও নিভৃতচারী সাহিত্যিকের পরিচিতি তুলে ধরা হতে থাকে। সাথে এই সমাজের পত্র-পত্রিকা, বই-পত্র নিয়ে ও আলোচনা চলতে থাকে।

অসংখ্য মানুষ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রাকে নির্ধারণ করি এবং ১৯অক্টোবর ২০২০ আমাদের সমিতির আনুষ্ঠানিক পথ চলা শুরু হয়—

১. অনালোচিত, বিস্মৃতপ্রায়, উদীয়মান ও নিভৃতচারী সাহিত্যিকদের অনুসন্ধান ও সম্মাননা জ্ঞাপন।

২. পশ্চিমবঙ্গের ব্লক স্তর পর্যন্ত সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে তোলা।

৩. প্রবীণ ও নবীনদের মধ্যে বই ও পত্র-পত্রিকা পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।

৪. সংখ্যালঘু ও পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় পরিচালিত পত্র-পত্রিকাগুলোর অনুসন্ধান ও প্রচার প্রসারে সহায়তা।

৫.কবি - লেখকগণের প্রকাশিত গ্রন্থগুলি প্রচারে আনা।

৬. সারা রাজ্য জুড়ে ব্লক ধরে ধরে বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিক সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও তার প্রচার-প্রসার।

৭. ভ্রাম্যমান সাহিত্য আড্ডার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি

৮. সাহিত্যক্ষেত্রে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন।

৯. সমিতির গ্রন্থাগার স্থাপন ও সংরক্ষণ।

১০. পত্রিকা ও গ্রন্থ প্রকাশনা

১১.শিশু-কিশোর সাহিত্য সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান মেধা অনুসন্ধান।

১২. মানবিক সমস্যাদির প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

আমরা এখানেই থেমে নেই। বিভিন্ন জেলা জুড়ে পরিক্রমা শুরু হয়েছে। একজন করে জেলা কোঅর্ডিনেটর এবং তার সঙ্গে উৎসাহী মানুষের নিয়ে গ্রুপ করে কাজ শুরু হয়েছে। সংগৃহীত সাহিত্যিক পরিচিতি নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে পরপর সংখ্যালঘু, দলিত, আদিবাসী সাহিত্যিকদের অনুসন্ধান করে 'সাহিত্যিক অভিধান' গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাথে বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা মণ্ডলি তৈরির প্রচেষ্টা চলছে। এর মধ্যেই আমরা গত ২০২১-২২ বর্ষে ভাঙড় (৯/২/২০২১), বর্ধমান (৭/৩/২০২১), সোনারপুর (৩১/১০/২০২১), বারাসাত (৬/০২/২২) এ সাহিত্য সভা করতে পেরেছি। বঙ্গীয় সাহিত্যিক অনুসন্ধান সমিতি ও শেরশাবাদিয়া সাহিত্য পরিষদের যৌথ উদ্যোগে মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে সানাউল্লাহ মঞ্চে গত ৮/০৫/২০২২ তারিখে মালদা সাহিত্য সভা-২২অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সাহিত্য সভার পাশাপাশি আমরা এ পর্যন্ত ৫১জন উদীয়মান নিভৃতচারী মহিলা সাহিত্যিকদের সংবর্ধনা দিতে পেরেছি। আজকের যারা শিশু-কিশোর আগামীতে তারাই দেশের চালক। কিন্তু পিছিয়ে পড়া সমাজের এই ভাবী প্রজন্মকে সাহিত্য সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে না পারলে আমরা সুন্দর ভবিষ্যত উপহার পাব না। সেই লক্ষ্যকে সমানে রেখে আমরা শিশু-কিশোর বিজ্ঞান মেধা অনুসন্ধানে লাগাতার প্রয়াস জারি রাখতে চাই। ইতিমধ্যে আমরা 'বঙ্গীয় শিশু কিশোর বার্তা' নামে একটি ত্রৈমাসিক ট্যাবলয়েড প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। খুব শীঘ্রই আমাদের সমিতি নিবেদিত 'সাহিত্যিক ডাইরেক্টরি-২০২৩'(পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজের কলমচারীদের ঠিকানাপঞ্জি সম্বলিত) এবং 'চেতনার সংকট ও উত্তরণ :পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজ' (সমাজ ভাবুক ও চিন্তাশীলদের কলমে) প্রকাশিত হতে চলেছে। আমাদের একটি মুখপত্র প্রকাশ করতে চাই। সেই সাথে আমরা প্রকাশনার বিষয়ে আগ্রহী।

বলার অপেক্ষা রাখে না, এক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ সকলের সহানুভূতি ও সহযোগিতা সাপেক্ষ বিষয়।

হৃদয়ের গহনে ছুঁয়ে যাওয়া সেই চুম্বন

মহম্মদ বাকীবিল্লাহ মণ্ডল

(ভ্রমণ-পিপাসুদের মনের অঙ্গনে সতত ছায়াপাত করে শৈলরাণী হিমালয়। তার অঙ্কদেশে অবস্থান করা দার্জিলিং, সিকিম এসব অঞ্চল নিজস্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ও মানবিক বৈশিষ্ট্যে প্রথমাবধি লুট করে নিয়েছে ভ্রমণকারীদের ভালোবাসা। তেমনি এক ভালোলাগা ও ভালোবাসার আখ্যান।)

মানুষ সুদূরের পিয়াসি, সুন্দরের পূজারী। বাঙালিদের ক্ষেত্রে এই কথাটি আরও বেশি করে প্রযোজ্য। চলমান সংসার জীবনের কাজের চাপে এবং ডাইনে-বামের নানান তিক্ততায় মানুষের মন যখন ক্লান্ত হয়ে ওঠে, মনের সুন্দর প্রায় ফিঁকে হয়ে আসে; তখন সেই একঘেঁয়েমি কাটানোর জন্য মানুষ বেরিয়ে পড়ে দু-চার দিনের জন্য, দূরে বা কাছে কোথাও, সাগরে-পাহাড়ে বা জঙ্গলে, প্রকৃতির সুখ সান্নিধ্যে। আর এ ব্যাপারে ভূ-ভারতে বাঙালিদের তুলনা মেলা ভার। স্বচ্ছল বাঙালিরা ভ্রমণের দৃশ্যগত সুখ নেওয়ার জন্য কিংবা গড় বাঙালি যতটা হিড়িকে পড়ে দেশ ভ্রমণ করে ততটা বিশ্বানুসন্ধ্যান বা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ থাকে না। হয়তো বা আত্মিক শান্তি খোঁজার ঐকান্তিক তাগিদও ততটা থাকে না। তবুও ভালো, ভ্রমণ কেন্দ্রগুলির বিভিন্ন পেশার মানুষজনেরা বাঙালি ভ্রমণার্থীদের পথপানে চেয়ে উন্মুখ হয়ে থাকে।

আমি একজন সাধারণ বাঙালি। ভ্রমণ আমার প্রিয় শখ। কিন্তু আমাদের না আছে সময়, না আছে বছরে ২-১ বার বিলাস ভ্রমণের জন্য যথেষ্ট আর্থিক স্বচ্ছলতা। তবুও কর্মজীবনের দীর্ঘকালীন বিরতি শুরু হলেই সাংসারিক দায়িত্বের সব বোঝা ঝেড়ে ফেলে, সব বন্ধন ছিন্ন করে ক'দিনের জন্য অন্তত মুক্ত বিহঙ্গ হয়ে মন ছুটে যায় দূরে, বহুদূরে।.....

সেই তাগিদ থেকেই আমরা কয়েকজন শিক্ষক-বন্ধু অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভেঙে, অনেক টানাপোড়েন উপেক্ষা করে গত পুজোর ছুটিতে পূর্ব-নির্ধারিত ভ্রমণ-স্পট-সিকিম এবং দার্জিলিংয়ে রওনা দিলাম। বন্ধুরা এই ভ্রমণতীর্থে দুই-একবার অ্যাডভেঞ্চার করেছে। কিন্তু আমার কাছে এই স্থানগুলো একেবারে আনকোরা নতুন। বন্ধুদের দেওয়া ফর্দ-অনুযায়ী গুছিয়ে নেওয়ার জন্য পাঁচদিন আগে থেকেই তারা তাড়া দিতে লাগলেন। কারণ আমাকে নিয়ে তাদের একটা সংশয় ছিল। যাইহোক, নির্দিষ্ট দিনে তাড়াহুড়ো করে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গুছিয়ে নিলাম।

বেরনোর একঘণ্টা আগে থেকেই প্রচণ্ড বজ্রপাত সহ মুসলধারায় বৃষ্টি নামলো। নির্দিষ্ট সময়ে শিয়ালদায় পৌঁছে নির্ধারিত সময়ে ট্রেন ধরতে পারবো কী না সেই চিন্তায় আমার টেনশন বেড়ে গেল।

বৃষ্টি থামলো না। বন্ধুদের প্রায় সকলেরই বাড়ি বাস পথ বা ট্রেন স্টেশনের কাছাকাছি। অতএব, তাদের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আমি থাকি প্রত্যন্ত গ্রামে। তাই অকাল বৃষ্টিতে আমি মুশকিলে পড়ে গেলাম। শেষমেশ দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলাম শত অসুবিধা সত্ত্বেও যেতে আমাকে হবেই। তাই আর ভাবনা-চিন্তা না করেই ভিজতে ভিজতেই বেরিয়ে পড়লাম। ছাতা মাথায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভিজছি। অটো বা ট্রেকারের দেখা নেই। অনেকক্ষণ পর পথ চলতি এক বাইক আরোহীর পিছনে সওয়ারী হয়ে, ভিজে চাবুড়-চুবুড় হয়ে বাস ধরলাম। ভিজে জবুথবু জোশহীন বাসটি আড়াই ঘণ্টা পরে আমাকে শিয়ালদায় উগরে দিল। ইতো মধ্যেই ভিজে পোশাক সব শরীরের তাপেই শুকিয়ে গেছে। ... আহারে খেয়ে নিলাম। প্লাটফর্ম ভিড়ে থিকথিক করছে। ট্রেন এল। সবাই ঠিকঠাক

যারযার সিট দখল করলাম। দূরন্ত বেগে ট্রেন ছুটে চললো তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে-রাতের আঁধার কেটে কেটে।

সকলে যে যার মতো খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়লো। টপ সীটে আমিও শরীর এলিয়ে দিলাম। বদ্ধ কামরায় বিচিত্র রবে নাক ডাকার প্রতিযোগিতা চলছে। আমার চোখের পাতা এক হচ্ছে না। চলন্ত ট্রেনের ঝিকঝিক-ঝিকঝিক ঘড়াৎ ঝিকঝিক-ঝিকঝিক ঘড়াৎ আওয়াজে আমার ঘুম আসে না। তার উপর বাড়তি পাওনা টয়লেট এবং ট্রেনলাইন বরাবর ভরপুর দুর্গন্ধ। ট্রেন ছুটছে, গাড়ি দুলছে।.....

আমার প্রত্যাভিজ্ঞায় কড়া নাড়ছে হাজার হাজার হিজিবিজি ও আজগুলি সব চিন্তা। চলন্ত গাড়িতে কোনদিনই আমার ঘুম হয় না। আজকেও সারারাত বিনিদ্র কাটালাম। ভোরের শেষে কখন যেন একটু তন্দ্রা এসেছিল। চায়ের আওয়াজে উঠে বসলাম। হাত মুখ ধুয়ে মোটামুটি ফ্রেস হয়ে নিলাম। চা-বিস্কুট সেরে বসে আছি-উদাসীন। ট্রেন NJPতে পৌঁছালো পরের দিন সকাল ৯.০০টা ২০ মিনিটে।

স্টেশন চত্বরের বাইরে 'Parking Spot'-এ দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের BOLERO গাড়ি। ড্রাইভার সাইন খুব সুন্দর দেখতে। যে কোন বলিউড নায়ককে হার মানাতে পারে। সকালের প্রাকৃতিক কর্ম সেরে গাড়িতে চড়ে বসলাম আমরা সাতজন। গাড়িতে বসেই সাইনের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় এবং ভাব বিনিময় হল। সে ও খুব মিশুকে। বাংলা বুঝতে পারে, কিন্তু বলতে পারে থোড়া থোড়া। নানান কথাবার্তা, সংলাপ, মস্করায় আমাদের গাড়ি ছুটে চললো প্রকৃতির সুন্দর অবগাহন করতে করতে। সাইনও আমাদের কথাবার্তার মাঝে ঢুকে গেল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সে আমাদের একজন আপনজন হয়ে গেল। যে আমাদের সাবধানে বহন করে নিয়ে যাবে তার সঙ্গে তো আত্মার যোগাযোগ গড়ে তুলতেই হবে। আমাদের প্রথম গন্তব্য স্থল সিকিমের লিংতামের-Silk Route Resort. সবুজের বুক চিরে সোজা কালো রাস্তা ছুটে চলেছে পাহাড়ের দিকে। দু-পাশে শাল সেগুনের বনানী। মানুষের বসবাস তুলনামূলকভাবে কম। মনে মনে ভাবছিলাম আমার ঘর যদি এই শান্ত প্রকৃতির কোলে হত তাহলে কতই না ভাল হত।

গাড়ি সিকিমের মাটি ছুঁলো। আঁকা বাঁকা রাস্তা। মাঝে মাঝে অবশ্য বেশ খারাপ। নতুন করে মেরামত হচ্ছে। রাস্তা এক-একটা বাঁক নিচ্ছে আর ক্রমশ উচ্চতায় উঠছে। চারিদিকের পাহাড়ি সৌন্দর্যে আমি মোহিত হয়ে যাচ্ছি। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ। ঠান্ডার ছোয়া বেশ লাগছে। পথিমধ্যে দুই জায়গায় আমাদের গাড়ি থামলো। প্রথম যেখানে থামলো সেখানে পাহাড়ের নীচে বেশ কিছু দোকান-পসারি আছে। চা-টা খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে নিলাম। আরও দু-ঘণ্টা পরে লোহাপুল নামক একটা জায়গায় একটু থামলাম। সবুজ পাহাড় ঘেরা ছোট্ট সমতল জায়গা এটি। সকলকে ঝোড়ো নাড়া কাকের মতো দেখাচ্ছে। হাত-পা ছেড়ে একটু ফ্রেস হয়ে নিলাম। এখানকার ঠান্ডা বেশ গায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। বাতাসের স্রোত বইছে। আবার গাড়ি ছুটলো। রাস্তার শুধু বাঁক আর বাঁক। রাস্তায় মানুষ চলাচল নেই বললেই চলে। মাঝে-মাঝে রাস্তা নির্মাণের সামগ্রী বহনকারী দু-একটা লরী চোখে পড়ছে। আর আছে রাস্তার কাজে রত নারী-পুরুষের শ্রমিক দল। আমাদের সমতলের মতো গ্রাম এখানে নজরে পড়লো না। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে দু-চার ঘর বাসিন্দা, না আছে বাজার না আছে দোকান-পাট। তবে, রাস্তায় লোমশ কুকুরের দল বেশ লক্ষ করা গেল। কথায়-কথায় প্রায় ৫ ঘণ্টা পার হয়ে গেল। বেশ ক্লান্ত লাগছে। ৬ ঘণ্টার মাথায় লিংতাম পৌঁছলাম। ছবির মতো সুন্দর জায়গা। বেশ বড় এবং সুন্দর রিসর্ট। হোটেলের সামনে রঙ-বেরঙের ফুলের বাহার। উত্তরে-দক্ষিণে পূবে-পশ্চিমে নধর নধর পাহাড় সুন্দরী। জানাগেল, উত্তরের পাহাড়ের পিছনে ভূটান সুন্দরী।.....

বিকেল সাড়ে তিনটে বাজে। রিসর্টের ভিতরের ব্যবস্থা বেশ ভালো। তার থেকে আরও ভালো রিসর্টের মালকিন। সুন্দরী, ধীর, স্থির, শান্ত, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতী এবং অমায়িক তার ব্যবহার। বয়স ৫৫-৫৬ বছর হবে হয়তো বা। ব্যবসায়িক হিসেবিয়ানাটা বাদ দিলে তার আর সব কিছুই ভালো বলে মনে হল।

গরম জলে চান-টান সেরে, ফ্রেস হয়ে বিকেল চারটের সময় লাঞ্চ খেলাম। জিরেকাটি চালের ভাতের সাথে ডাল সবজি, ডিমের ঝোল, চাটনি, পাঁপড়, মিষ্টি সহযোগে আহারটা বেশ ভালই হল। খাওয়ার পরে আধঘণ্টা মতো রেস্ট নিলাম। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য হেলে পড়েছে। তার সোনালী আলোর ছটা পাহাড়ের সবুজে সবুজে মাখামাখি করছে। কী অপরূপ রূপ সৌন্দর্য এই সিকিম সুন্দরীর! একটু বাদেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ঠান্ডা কাঁপুনি ধরিয়েছে। আমরা সবাই কম্বলের তলায় নিজেদেরকে সঁপে দিলাম। চারিদিকে নীরব নিস্তব্ধতা। সামনে

আর একটা হোটেলের বাইরের লনে কয়েকজন পর্যটক সুরাপান করছে। তাদের কলকাকলি ভাঙছে পাহাড়ি রাতের নির্জন-নীরবতা। রাত দশটায় রাতের আহার কমপ্লিট করে পাড়ি দিলাম ঘুমের দেশে।

সারাদিনের ধকলে ক্লান্ত ছিলাম। ঘুমটা বেশ ভালোই হল। বাড়িতে প্রতিদিন ভোরের আজানের সুরে ঘুম ভাঙে। এটাই আমার অভ্যাস। এখানেও খুব ভোরেই ঘুম ভাঙলো। কম্বলের নীচে দারুণ আরামে শুয়ে থাকলাম। সকাল সাড়ে ছটায় বিছানা ছেড়ে, হাত-মুখ ধুয়ে, চা-টা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম 'Site Scene' প্রত্যক্ষ করতে।

মালকিন আমাদের বসতে বললেন, কথায় কথায় তাকে জিজ্ঞেস করলাম– ''কর্তা বাড়িতে নেই বুঝি?'' ভূটিয়া সেই ঘরওয়ালি ভালো বাংলা বলতে পারে না। আধো বাংলা আর আধো ভূটিয়া ভাষায় জানালো যে, ''১৫ দিনের জন্য কর্তা ক্ষেতিতে কাম করতে গেছে।'' দীর্ঘদিনের পরিচিত মানুষের মতোই জিজ্ঞেস করলাম– ''এই পাহাড়ি আঁধারে আপনাদের ভয় লাগে না?'' ভূটিয়া ভদ্রমহিলার চৌকস উত্তর– ''এখানে চোর নেই, তাই মানুষের ভয় নেই। আমরা বেশ নিরাপদেই আছি।''

সকালে সোনা রোদের বিচ্ছুরণে চারিদিকে নয়নাভিরাম পরিবেশ। কোমল সূর্যের নরম আলো যেন পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে গাছ-গাছালি আর সবুজ বনানীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। মনে দোলা দিচ্ছে আনন্দের ঢেউ। মুঠোফোনে ধরে রাখলাম তার কিছু দীপ্যমান দৃশ্য।

হোটেল থেকে ৫ মিনিট দূরত্বের ব্যবধানে শুনতে পাচ্ছি অবিরত ঝরনার গর্জন। অবুঝ মন ভাবছে, এত জল ক্রমাগত কোথা থেকেই বা আসে আর কোথায়ই বা যায়? পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম পাহাড়িয়া গ্রামের পথে পথে। খুব সুন্দর গ্রাম। অবিন্যস্ত ঘর বাড়ি। ঝৈ-ঝক্কি নেই, হৈ-হট্টগোল নেই। ছোট ছোট পাহাড়ি সমতলে, চাষের খেত আর পাহাড়ের গায়ে গায়ে ধাপ চাষের জমি। উচ্ছে ভেণ্ডি, বরবটি, আদা প্রভৃতি সবজির সমারোহ। তাছাড়া, লাউয়ের মতো একধরণের সবজির প্রাচুর্য, কিন্তু লাউ নয়। মানুষ জন তেমন চোখে পড়লো না। দুই একটা বাড়িতে গরু ছাগল বাঁধা আছে। ছোট ছোট উঠানের চাতালে মুরগী চরে বেড়াচ্ছে। তবে মনে হল কুকুর এখানকার কমন প্রাণী। বন্ধুর পথে পায়ে পায়ে হাঁটছি আর কামারের হাপরের মতো হাঁপাচ্ছি। উপস্থিত হলাম একটা ভূটিয়া পরিবারের আঙিনায়। মালকিন তার পোষা গরুকে খেতে দিচ্ছে। বাড়িওয়ালির দুই মেয়ে, বয়স ২০-২২ হবে। ছোট জনের বয়স আন্দাজ ১২-১৪ বছর। ঘরের এক কোণায় সে পড়াশুনা করছে। পরিষ্কার নিকানো দাওয়া। মালকিন আমাদের বসতে বললেন, কথায় কথায় তাকে জিজ্ঞেস করলাম– ''কর্তা বাড়িতে নেই বুঝি?'' ভূটিয়া সেই ঘরওয়ালি ভালো বাংলা বলতে পারে না। আধো বাংলা আর আধো ভূটিয়া ভাষায় জানালো যে, ''১৫ দিনের জন্য কর্তা ক্ষেতিতে কাম করতে গেছে।'' দীর্ঘদিনের পরিচিত মানুষের মতোই জিজ্ঞেস করলাম– ''এই পাহাড়ি আঁধারে আপনাদের ভয় লাগে না?'' ভূটিয়া ভদ্রমহিলার চৌকস উত্তর– ''এখানে চোর নেই, তাই মানুষের ভয় নেই। আমরা বেশ নিরাপদেই আছি।''

এখানকার গ্রামের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, উপার্জনের অবলম্বন হিসাবে প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই চার চাকার গাড়ি আছে।

আঁকা বাঁকা সরু পথ নেমে গেছে নীচে। সামনেই একটা পাহাড়ী নদী। তার উপর ঝুলন্ত সেতু। তার নীচ দিয়ে অবিরত বয়ে চলেছে ঝরনার জলের দূরন্ত স্রোত। দুদিকে পাহাড়। দারুণ উপভোগ্য। আমরা সেখানে প্রায় এক ঘণ্টা সময় কাটালাম। ক্যামেরার গ্যালারি ভরে গেল ছবিতে ছবিতে। আজ ৯.০০ টার সময়ে বেরিয়ে পড়লাম আরিটার লেকের উদ্দেশ্যে। যাওয়ার পথে পথে সাক্ষী হলাম অনেকগুলো ঝরনার।

আরিটার লেকে পর্যটকদের তেমন ভিড় ছিল না বললেই চলে। লেকের জলে হাঁসেরা খেলা করছে। ছুটে বেড়াচ্ছে মাছেদের ঝাঁক। পরিষ্কার আকাশ। মন খুলে সূর্য বাবু আলো দিচ্ছেন। লেকের জল তেমন পরিষ্কার বলে মনে হল না। লেকের বোটগুলো ঘাটে বাঁধা, ঢেউ খাচ্ছে। বোটিং বন্ধ ছিল। অতএব, আমাদেরও বোটিংয়ের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হল।

লেকের রেলিং ঘেরা পথের বাঁকে বাঁকে ঝলসে উঠলো ক্যামেরার আলো। যে যার মতো ছবি নিল। অন্যদলের কিছু যুবক-যুবতীদের কল-কাকলী আর হাঁসির ঝংকারে জায়গাটা লাস্যময়ী হয়ে উঠলো। লেকের দক্ষিণ-পশ্চিমের রেলিং ঘেরা পথ অতিক্রম করে আমার সঙ্গীরা পৌঁছে গেছে 'View Point'- এ। আমি হাঁটুর ব্যথায় কাতর। ভিউ-পয়েন্টে উঠতে আমার খুবই শ্বাস কষ্ট হচ্ছিল। ভয় হচ্ছিল, হঠাৎ যদি হাট অ্যাটাক করে। হাসলাতাল পাব কোথায়? বেঘোরে মরতে হবে যে। তখনই আমার মেয়ে, ছেলে এবং পরিবারের কথা খুব খুব মনে পড়ছিল। তবুও, সাহসে ভর করে আস্তে আস্তে উঠলাম ভিউ পয়েন্টে।

পাহাড়ের সবুজের আবরণে সোনালী রোদের অপূর্ব ঝিলিক। একটু পরেই কুয়াশার চাদরে ঢেকে গেল নীচ-উপর পাহাড়ময় সব জায়গা। পাহাড়ি আবহাওয়া বোঝা সত্যিই বেশ মুশকিল। ঠিক যেন শিশু হরিণীর মতো। এই কাছে আসে তো এই পালায়।.....

'View Point'-এর বসার জায়গায় মিনিট ১৫ বিশ্রাম নিলাম। বারংবার ড্রাইভারের ফোন ঢুকছে। এবার ফিরতে হবে। তাড়াহুড়ো করে নীচে নেমে এলাম। গাড়ি ছেড়ে দিল। ড্রাইভার সাইন বেশ রসিক। নানান রঙ্গ রসিকতায় সে গাড়ির ছুট কাটাচ্ছে। পথে পথে রবিঠাকুরের 'ওরা কাজ করে।' বেশির ভাগই মহিলা শ্রমিক।

পাহাড়ের সৌন্দর্য্য ভাষায় বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রতিটি ফুটের সৌন্দর্য্য আলাদা আলাদা। ফিরতি পথে গাড়ি পৌঁছালো রঙ্গলি বাজার। সেখানকার দোকানগুলিতে ভিড় চোখে পড়ার মতো। এখানেই সরকারি অফিস। ভোটের কার্ড, আধার কার্ড আর ফটো জমা দিয়ে সিকিম ভ্রমণের পাশ নিতে হয়। নিজের উদ্যোগে সাইন সেই কাজ করেছিল। চল্লিশ মিনিট মতো সময় খরচ হল। সেই সুযোগে আমরা টুকটাক শীতের পোষাক কিনে নিলাম। এইখানকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বেশিরভাগই 'Chinese Product' । গুণগত মান ভালো-মন্দ মিশিয়েই আছে। তবে, দাম খুব বেশি চায়। খরিদ্দারকে খুব সতর্ক হয়ে খরিদ করতে হয়। মেয়ের জন্য ১০০০.০০ টাকা দিয়ে শীতবস্ত্র কিনলাম, যার দাম চেয়েছিল ২২০০.০০ টাকা; তবুও পরবর্তীতে আমার মনে হল, যে আমি ঠকে গেছি।

সাইনের (ড্রাইভার) কাজ কমপ্লিট। তার তাড়ায় গাড়িতে উঠে বসলাম। মিষ্টি মধুর গান শুনতে শুনতে আঁকা-বাঁকা পাহাড়ি পথে গাড়ি ছুটতে লাগলো। উপরে পরিষ্কার নীল আকাশ। পথের দুই ধারে অগোছালো সবুজ পাহাড়। ঘন ঘন মেঘ রোদের খেলা। পথের বাঁকের মোড়ে আর গাড়ির ঝাঁকুনিতে পিছনের সিটে বসে আমার কোমরের স্প্রিং ঢিলা হয়ে গেল। এখন অনেকটাই ক্লান্ত প্রায়। সাড়ে তিনটে নাগাদ সময়ে হোটেলে পৌঁছলাম। চান সেরে লাঞ্চ খেলাম। তারপর কম্পলের নীচে তাপ নিতে নিতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভাঙলো তখন সন্ধ্যা সাতটা। সেদিন সন্ধ্যায় অলস মন আর কোথাও বেরুতে চাইল না। অতএব, উপোসী হৃদয়ে অজস্র সুখ-অসুখ ''খুঁটে খুঁটে তুলছিল পরম যত্নে।''

সিংতামের এই চত্বরটি বেশ ফাঁকা ফাঁকা। হোটেল-রিসর্ট ও তুলনামূলক কম। তবে 'Home Stay'-র ব্যবস্থা আছে প্রায়ই বাড়িতে বাড়িতে। তন্দ্রাচ্ছন্ন আমি। একটু পরে দেখি আমার রুমের সঙ্গীরা কেউ রুমে নেই। কম্বল জড়িয়ে সামনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বিজলীবাতির আলোয় সামনের রঙ-বেরঙের ছোট বড় নানান ফুল যেন হাসিতে লুটোপুটি খাচ্ছে। সামনের হোটেলের সবুজ লনে সাজানো টেবিলে টেবিলে চলছে উল্লাসের ফোয়ারা। পায়ে পায়ে সেখানে এগিয়ে গেলাম। সঙ্গী প্রধান শিক্ষক বন্ধু জিয়াউল হক। পরিচয় বিনিময় হল।

এই হোটেলটি কটেজ টাইপের। মালিক ছেলেটি বাঙালি এবং বেশ জুনিয়র। তারা উত্তর ২৪ পরগনার সোদপুরের বাসিন্দা। ভারতের বিভিন্ন ভ্রমণতীর্থে তাদের হোটেল ব্যবসা। মূল হোটেলের পাশে বড় একটি TENT. ভ্রমণার্থীদের সংখ্যা বেশি হলে সেটা তারা ব্যবহার করে। হোটেলটির রাঁধুনি, পরিবেশনকারী ও অন্যান্য কাজের সহযোগিদের বেশির ভাগই হলো Young মেয়ে। তারা প্রায় সবাই ভূটিয়া। নেপালি, তিব্বতি বা সিকিমিজ। মালিক ছেলেটির সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে জানা গেল যে, ভূটিয়া বা নেপালিরা পরিশ্রমী, অনুগত। সরল, আপ্যায়ণপ্রিয়। কিন্তু ব্যবসায়িক বা স্বার্থ চিন্তায় বেশ সচেতন। কথায় কথায় জানতে চাইলাম, যে সিকিমিজদের শিক্ষাদীক্ষার চালচিত্র কেমন? মালিক ছেলেটির কথায় জানা গেল, সেখানকার Young ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া বেশি করে না। একটু বড় হলেই (১০-১২ বছর) বাপ-মা কাজের সন্ধানে

সন্তানদের ছেড়ে দেয়। অল্পবয়সে ছেলে-মেয়েরা স্বাধীন। যৌবনেও স্বাধীন। কিন্তু স্বাদহীন নয়। সিকিমে সামাজিক বিবাহের রীতি পদ্ধতি (Social Marrige system) নেই বললেই চলে। ইচ্ছা-খুশি যুবক-যুবতীরা সঙ্গী বা সঙ্গিনী খুঁজে নিচ্ছে, আবার তাদেরকে ইচ্ছামতোই ত্যাগ করছে। সামাজিক বাঁধন বলে কিছুই প্রায় নেই। এমনকি, অনেকক্ষেত্রে পিতৃ-মাতৃ পরিচয় সুনির্দিষ্ট নয়। জীবনের জন্য কর্মের পথে বেরিয়ে পড়ে। জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে বাধাহীন।

অর্থনীতির নিরিখে গরিব মানুষ যেমন আছে তেমনি আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল মানুষের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। অর্থবান লোকেরা জমি- জায়গা লিজ দিয়ে ব্যাঙ্কে Liquid money গচ্ছিত রেখে তার সুদের টাকায় সংসার চালায়। এখানকার মানুষের রুজি- রোজগারের আর একটি দিক হল এই যে, প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে পরিবহন বা গাড়ির (পর্যটক পরিবহন/ পণ্য পরিবহন) ব্যবসা। তাছাড়া, এখানকার পাহাড়ে কম বেশি ধানচাষ হয়। এতক্ষণ হোটেল মালিক সুদীপের কথা যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে শুনছিলাম। তার কথা শেষ হলে আবার প্রশ্ন করলাম– আচ্ছা, মদ কী এখানে commonfact"?– সঙ্গে সঙ্গে কথাটি স্বীকার করে নিল সুদীপ। সে বরং আরও জানালো যে, যেহেতু সিকিমে জনসংখ্যা কম তাই এখানকার মানুষের বেঁচে থাকার একটা না একটা পথ ঠিকই বেরিয়ে যায়। আমার কৌতূহলের শেষ নেই। আবার প্রশ্ন করলাম–" এখানে যারা আসেন তারা কী সবাই মদ খান? সুদীপের চটজলদি উত্তর– "ঠিকই ধরেছেন। এখানে যারা আসেন তারা মূলতঃ মস্তি-মৌজ করতেই আসে"। অনেক রাত হয়ে গেছে। রাতের খাবারের জন্য আমাদের হোটেল থেকে ডাক আসছে। আমরাও ক্লান্ত। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে হবে। অতএব, শেষ প্রশ্ন তার কাছে রাখলাম– "এখানে পর্যটকদের ভরা মরসুম কোন সময়?" সুদীপ জানালো যে, ভ্রমনের 'pick season' হল, march to october, এবং নভেম্বরের প্রথম ১৫ দিন।' কথা আর শেষ হয় না, আমাদের হোটেলের দিকে পা বাড়িয়েই সুদীপকে জানালাম– "আবার এলে, আপনাদের হোটেলেই উঠবো।" তিনি খুব খুশি হলেন এবং আমাদেরকে আগাম well come জানালেন। দ্রুত চলে এলাম আমাদের রিসর্টে। রাত সাড়ে নয়টা বাজে। ডিনার খেয়ে নিলাম। চারিদিকে নিঝুম নিস্তব্ধতা। আমাদের ঘরে সকলে চলে এলো। কিছুক্ষণ আড্ডা হল। রাতের নীরবতা ছিন্ন করে পাহাড়ের গায়ে গায়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো হাসি, তামাসা আর মস্তি- মস্করার বিচিত্র কল্লোল। খান খান করে দিচ্ছিল– পাহাড় দেশের 'নিভৃত ভূবন'। রাত্রি গাঢ় হলো। আড্ডা হল শেষ। যে যার বিছানায় ডুবে গেলাম, কচি শিশুর মতো।

পরের দিন সকাল ছটা নাগাদ উঠলাম। রাতে ভালো ঘুম হয়েছে। হোটেল বয় চা দিয়ে গেল। এবার কিছু কেনাকাটার জন্য বার হলাম। শুনেছিলাম এখানকার কয়েকটি বাড়িতে নাকি দেশি- বিদেশি জিনিসপত্র পাওয়া যায়। জিজ্ঞাসায় জিজ্ঞাসায় অনেকটা ঘুরলাম। কিন্তু এত সকালে তখনও লিংতামের সবাব ঘুম ভাঙেনি, ফেরার তাড়া ছিল। তৈরি হয়ে হোটেল ছাড়তে হবে। অতএব কোন কিছু কিনতে না পারার মনোকষ্ট নিয়ে হোটেলে ফিরলাম। এবারের destination গ্যাংটক। সকাল ৯.০০ টার সময় গাড়ি ছাড়বে।

একটা মুশকিলে পড়লাম। দেখি আমার জুতো পাওয়া যাচ্ছে না। অতএব হোটেলের মালকিনকে জানালাম। তিনি তো আকাশ থেকে পড়লেন। "সে কী! জুতো চুরি হয়ে গেছে?" বললেন, "আপনার ভুল হচ্ছে না তো? ভাল করে খুঁজে দেখুন।" উত্তরে আমি বললাম, "ভাল করে দেখেই বলছি। মিথ্যা কেন বলবো।" তিনি বেশ জোর দিয়েই বললেন, "সিকিমে কোন চোর নেই। এখানে চুরি হয় না।" তিনি জানতে চাইলেন, "রুমে কে ঢুকেছিল?" বললাম-- "আপনার হোটেলের বয় সৌরভ ঘরে ঢুকেছিল"। তিনি সৌরভকে ডেকে সরাসরি hit করলেন– "তুই জুতো চুরি করেছিস কেন?" সৌরভ তো আমার উপরে ক্ষেপে লাল। তার খুব মানে লেগেছে। এবার সৌরভের রাগ আমার উপরে আছড়ে পড়লো– "আপনি বলেছেন যে আমিই জুতো চুরি করেছি?" আমি জানালাম যে– "আমি একবারও বলিনি যে তুমি জুতো চুরি করেছো। আমি শুধু জানিয়েছি যে আমার জুতো পাচ্ছি না।" যাইহোক, শেষ মেশ তার কাছ থেকেই জুতো জোড়া পাওয়া গেল। সৌরভ আমাদের বীরভূমের ছেলে।

silk route resort- এর পাশেই মালকিনের এক আত্মীয়ের বাড়িতে চায়না সামগ্রী পাওয়া যায়। সৌরভ আমাকে নিয়ে গেল– সেই বিপণী বাড়িতে। সে একজোড়া জুতো কিনলো। মালকিন তো তাকে ভীষণ বকাবকি করলেন–''সৌরভ তুই আবার জুতো কিনেছিস কেন?'' সৌরভ আমতা আমতা করতে লাগলো। মালকীন বললেন– ''আমি তো মনে করলে প্রতিদিন দশ- বিশটা করে জিনিস কিনতে পারি। কই আমি কী কিনেছি?'' তিনি আরও বললেন, ''শোন সৌরভ, বাজারে গেলে মনে হবে সব গুলোই কিনে নিতে। কিন্তু মনে রাখবি, বাজারের সব জিনিসই কিন্তু তোর জন্য তৈরী হয়নি। তৈরী হয়েছে ভারতের ৯৩৫ কোটি মানুষের জন্যে। তোকে তো বাড়িতে টাকা পাঠাতে হবে।'' ষোল আনা খাঁটি কথা। মালকীনের প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরে গেল। মনে মনে তাকে সেলাম ঠুকলাম। কারণ, আমারও যে অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটার বাতিক আছে।

যাইহোক, সকাল ৯.০০ টার মধ্যে গুছিয়ে- গাছিয়ে রেডি হয়ে নিলাম। সাড়ে ন'টায় গাড়ি ছেড়ে দিল। বিদায় লিংতাম। গন্তব্য গ্যাংটক।

ড্রাইভার সাইন আঁকা বাঁকা পাহাড়ি পথে তুরান বেগে গাড়ি চালাচ্ছে। আমরা তো গাড়ির মধ্যে এপাশ- এপাশ করছি। কোমরে ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। সকালের পরিবেশ দারুণ মনোরম। রাস্তার ধারে ধারে পাহাড়ি গাছ কাটা হচ্ছে। সম্ভবত রাস্তা চওড়া হবে। চারিদিকের পাহাড়ি সৌন্দর্য আমার মনকে এক অদ্ভুত আনন্দ দিচ্ছে। উপরে নীল আকাশ। চারিদিকে সবুজে সবুজ। যা কিছু ঈশ্বরের সৃষ্টি সত্যিই অপার সুন্দর, অতুলনীয়। গাড়ি ছুটছে। এক জায়গায় গাড়ি হঠাৎ জোরে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল। মোবাইল হাতে এক সুন্দরী যুবতী, অনাড়ম্বর বেশবাস; একেবারে বাঙালি ঘরোয়া মেয়ের মতোই মনে হল তাকে। মেয়েটির সঙ্গে সাইন (ড্রাইভার) মিনিট দুয়েক কথা সেরে নিল। তারপর মেয়েটি আলতো করে সাইনের গাল টিপে দিল এবং দুহাতে তার চোয়াল ধরে সাইনের মুখটা তার মুখের কাছে টেনে নিল এবং গভীর রোমান্টিকতায় ড্রাইভারের চোখে, ঠোঁটে চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিল। ড্রাইভার পরম তৃপ্তিতে সেই চুম্বনের সোহাগ নিল। গাড়ির মধ্যে আমরা সবাই নিজের মধ্যে হারিয়ে গেলাম। শিহরিত আবেগ মেখে, ধীর স্থির মেয়েটি দাঁড়িয়ে থাকলো। সাইনও স্টিয়ারিংয়ে মাথা রেখে দু মিনিটের মতো সময় চুপচাপ ভালোবাসার অনুরণনে ডুবে গেল।

গাড়ি ছেড়ে দিল। এই অকৃত্রিম ভালোবাসার পরশে আমরাও আবেগ মথিত, চুপচাপ। পিছন ফিরে দেখলাম ছল ছল চোখে সেই পাহাড়ি কন্যা ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়। একটু পরে গাড়ি বাঁক নিল। মেয়েটি আমাদের চোখের আড়াল হল। কিন্তু তাদের দুজনের এই আত্মিক ঘনিষ্ঠতা আমাকেও বিহ্বল করলো। হৃদয়ের গহনে চিরকাল ভাস্বর হয়ে থাকবে- দুজন পাহাড়ি যুবক- যুবতীর হৃদয় উজাড় করা সেই চুম্বন।... গুনগুনিয়ে ভালোবাসার রেশ একটু একটু করে কেটে যাচ্ছে। সাইন গান গাইছে– ''ও সাথীরে ... তেরেভি বিনা ...'' গাড়ির গতিবেগ বাড়াচ্ছে। রাস্তার বাঁকে বাঁকে গাড়ির মধ্যে আমরা যেন দোলনায় দুলছি। বেশ কয়েক কিলোমিটার অতিক্রম করার পর আর একজন নধর সুন্দরীর হাতের ইশারায় হঠাৎ করেই ড্রাইভার গাড়ি থামালো। তাদের মধ্যে ৩-৪ মিনিট হাসি- ঠাট্টা হলো। মেয়েটি সাইনের ছবি তুললো। নাক টিপে আদর করলো। পোশাকে-আশাকে মেয়েটিকে ইউরোপীয়ানদের মতো লাগছিল। বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে বলেই মনে হচ্ছিল। আমাদের অবাক করে দিয়ে চকিতে সাইনের মাথা টেনে ধরে তার দুই চোয়ালে গভীরভাবে এঁকে দিল চুম্বনের আল্পনা। তবে, প্রথম চুম্বন ছিল হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা ভালোবাসার স্মারক, আর দ্বিতীয় চুম্বনে ছিল শরীরী আকাঙ্ক্ষার ঝিলিক। যাইহোক, এই ঘটনায় সাইন একটু লজ্জাও পেল বটে। কথায় কথায়-পৌঁছে গেলাম- ' Q- khola falls'

খুব সুন্দর এই জলপ্রপাত। অনেক উঁচু থেকে ঝরছে ঝরনার জলধারা। বড়ই শ্রুতি মধুর তার ঝমঝম বাজনা আর হৃদয়াভিরাম তার ছলছল আবেগ। কোথা থেকে যে এই জল ধারা আসে তা দেখার খুবই ইচ্ছা আমার। কিন্তু দেখার ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়। সেখানে বন্ধুরা মিলে খুব আনন্দ করেছিলাম। ছবি তুললাম। অনেকটা সময় পার হয়ে গেল। ড্রাইভার তাড়া লাগালো। গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি ছুটছে। আমাদের গাইড এবং দল নেতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মহাশয় রসিদ সাহেব ভ্রমণেচ্ছুক জায়গাগুলির, তালিকা করে এনেছেন। তার লিস্ট অনুযায়ী পরবর্তী গন্তব্যস্থল কালিঝরা জলপ্রপাত।

(ক্রমশ)

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে

আব্দুল বারী

(আমাদের গ্রাম-জীবনের ভাঙন এখন এতটাই দ্রুত যে আর কিছুদিনের মধ্যে হয়তো এর সনাতন রূপ রীতিমতো অনুসন্ধানকারীর অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে উঠবে। স্মৃতির পাতা উল্টে উল্টে গ্রাম-সংস্কৃতির পাঠ নেওয়া ও তার লিখিত ভাষ্য প্রণয়ন আজ তাই বিশেষ জরুরি। লেখক তাঁর মতো করে সচেষ্ট হয়েছেন।)

ছয়রদ্দিন মন্ডলের বারান্দায় হ্যারিকেন জ্বলছে, সন্ধ্যার আঁধারে বারান্দার নিমটেলের নিচে হুক থেকে হ্যারিকেন ঝোলানো হয়েছে। এখানে হ্যারিকেন জ্বলা মানে গ্রামে কোন বিচার আছে। অবশ্য লোকমুখে বিচারের কথা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। বড় কোন সমস্যা, দশালি সম্পত্তির ডাক, প্রভৃতি বিষয়ে ঢ্যারা পিটানো হতো। পারিবারিক ঝামেলা, ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি, বউ তালাক এ সব বিচারের আয়োজনে হ্যারিকেন টাঙাত। গ্রামের মানুষ যারা বিষয়টি জানত না তারাও হ্যারিকেন দেখে জেনে যেত। এশার নামাজের পর বিচার পর্ব শুরু হতো। মোড়ল মাতব্বররা বসত পাকা মেঝের বারান্দায়। তাদের সঙ্গে কিছু লোকজনও। আর সাধারণ মানুষ বসত বারান্দার নিচে ফাঁকা জায়গায়। খড়ের আঁটি কিংবা ইঁট পাছায় দিয়ে বসত সব। বাদী বিবাদীদের কথা শুরু হলে সবাই চুপচাপ শুনত। একে একে বারান্দার নিচে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে তারা কথা বলত। মেয়েদের ঝগড়া বা মেয়ে ঘটিত কোন মীমাংসা থাকলে মেয়েরা মোড়লদের বাড়ির ভিতর থাকত। বারান্দার পাশে একটা জানালা ছিল। মেয়েরা সেখান থেকে কথা বলত। কথার মাঝে বাদ প্রতিবাদ হলে মোড়লরা ধমক দিয়ে থামিয়ে দিত। একে একে সকলের কথা শোনা হতো।

মাঠে ঘাস কাটা, ফসল চুরি, ছাগল মারা থেকে শুরু করে ভায়ে ভায়ে লাঠালাঠি, বউ পেটানো, বৌ ছাড়, পাড়ায় পাড়ায় ঝামেলা সবের বিচার হতো। মানুষ শান্ত হয়ে বসে বিচার শুনত।

বাদী বিবাদীদের কথা শুনতে শুনতে রাত নয়টা দশটা বেজে যেত। কোন কোন দিন আরও বেশি রাত হতো। তারপর মোড়লরা বারান্দা থেকে উঠে গিয়ে আর একজনের বাড়ির ছোট ঘরে বসে বিচারের রায় তৈরি করত। এমন অনেকদিন গেছে বাদী বিবাদীর কথা শুনে রায় দিতে দিতে রাত একটা বেজে গেছে। এমন ঘটতো বউ তালাকের বিচারে কিংবা ব্যাভিচারের ঘটনায়। আবার সমাজের জটিল কোন সমস্যা নিয়ে বিচার শেষ করতেও অনেক রাত হয়ে যেত।

গরমের দিনে মানুষ হাতে তালপাতার পাখা নিয়ে বসত। মশা তাড়াত আর বিচার শুনত। কোন কোন দিন রাত বেড়ে যাওয়ায় কেউ কেউ উশখুশ করত। সকালে উঠে তো সবাই মাঠে যাবে। পরিশ্রমের কাজ। একটু ঘুম না হলে হয়। তবু বিচারে রায় শোনার লোভে উসখুশ করত আর বসে থাকত। খুব যে বিরক্ত হয়ে চিল্লাচিল্লি করত তা কিন্তু নয়।

বিচারের রায় দেওয়ার আগে একজন মোড়ল উঠে দাঁড়িয়ে বলত, দেখুন আমরা কেউ ফেরেস্তা নই। মানুষ। আবার মেলা লেখাপড়া জানা লোকও নই। কোন কোর্টের হাকিম উকিলও নই। আমরা আপনাদের মতো সাধারণ মানুষ। আমাদের বুদ্ধিতে যতটা কুলিয়েছে, বিবেকে যেটা লেগেছে আমরা কয়জন মোড়লভাগা বসে সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। হাতের পাঁচটা আঙ্গুল সমান নয়। উনিশ বিশ আছে। হয়তো বিচারের রায়ও উনিশ বিশ হবে। তবে তা আমাদের ইচ্ছাকৃত নয়। কারো উপর দুশমনি করে আমরা কিছু করিনি। খোদার কাছে জবাব

দিতে হবে। তাই যতটা পেরেছি ন্যায্য বিচার করার চেষ্টা করেছি। যা রায় হবে মাথা পেতে মেনে নিয়ে বাড়ি যাবা। ঠিক আছে।

গ্রামের সমবেত মানুষ বলতো ঠিক ঠিক। যা রায় হবে মানতে হবে। দুনিয়ায় দিনরাত সমান হয় না। চাঁদ সুরোজও ছোট বড়। আলো তেজে বেশি কম। এ নিয়েই তো সংসার। কেন মানবে না, খুব মানবে। রায় দেওয়া হোক, রায় দেওয়া হোক।

মোড়লরা রায় ঘোষণা করত। তাদের অপরাধের গুরুত্ব, আর্থিক সঙ্গতি , সামাজিক প্রতিপত্তি সবদিক মাথায় রেখে বিচারের রায় হত। সেই রায় মেনে নিতে খুব বেশি কষ্ট হতো না কারো। কোন কোন দিন একটু কড়া বিচার করা যে হতো না তা নয়। সামাজিক রাশ শক্ত হাতে ধরে রাখতে কোন কোন দিন বিচারের রায় বেশ কড়া করা হতো। জনতা সে রায় বাদী বিবাদীকে মানিয়ে নিয়ে তবে ছাড়ত। তার মানে এই নয় যে তাদের উপর জুলুম করা হতো। সমাজকে বেঁধে রাখতে, একসঙ্গে গ্রামীণ সমাজে সুখে শান্তিতে বাস করতে যেটুকু দরকার তাই করা হতো। গ্রামের লোকজনও তা সুন্দরভাবে মেনে নিত।

এমন একটি কড়া বিচার হয়েছিল সেবার গাউস শেখের। তার ছয় বেটা। কেউ কেউ জুয়া খেলে, মদ খায়। মাঝে মাঝে গ্রামে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে ঝামেলা পাকায়। সমাজ থেকে মোড়লরা তাদেরকে মদ, গাঁজা খাওয়া নিয়ে সতর্ক করে। সাময়িকভাবে নিষেধ মানে। তারপর আবার শুরু করে। তারা যুক্তি দেখায় আমরা তো গ্রামের ভিতর কিছু করছি না। গ্রামের বাইরে মাঠে জুয়া খেলি, গাঁজা খাই। আর এসব নিজের পয়সায় করি। তাতে মোড়লদের কি ?

অবশ্যই মোড়লদের মাথাব্যথার কারণ ছিল। তাদের খেলা দেখে গ্রামের অন্য ছেলেরাও জুয়াতে বসছে, গাঁজায় টান দিচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে গ্রামের প্রচুর ছেলে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই সেবার কড়াভাবে মোড়লরা নিষেধ করে। গ্রাম বা গ্রামের পাশে মাঠেও জুয়া খেলা, মদ খাওয়া যাবে না। সব বন্ধ করতে হবে।

এই নিষেধের পর ভেতর ভেতর দল পাকায় গাউসের ছেলেরা। সমাজকে অমান্য করে। মাঠে গাঁজা খায়, জুয়া খেলে, গ্রামের পথে মদ খেয়ে মাতলামি করে। গ্রামে ঢ্যারা পিটিয়ে মোড়লরা বিচার ডাকে। গাউসকে বিচারে থাকতে বলে। কারণ তাকে বারবার ছেলেদের শাসন করতে বলেছে মোড়লরা। সে নিজে তো শাসন করেনি বরং ভেতর ভেতর ছেলেদের মদত দিয়েছে। আড়ালে আবডালে সে নাকি মোড়লদের গালাগালিও করেছে। তাই আজ তারও বিচার। সমস্ত গ্রাম এসে বসেছে ছয়রদ্দিন মোড়লের বারান্দার কাছে।

অনেকক্ষণ কথা শোনার পর মোড়লরা উঠে যায় রায় তৈরি করতে। অনেকটা সময় নেয়। গ্রামের মানুষ জন তাকিয়ে বসে আছে আজ কি রায় দেবে মোড়লরা তার দিকে। গ্রামের মানুষ চাইছে এখনই এদের দল ভাঙুক। ঘুঘুর বাসা এখনই না ভাঙতে পারলে গ্রামকে রসাতলে দেবে এরা। তাই কড়া বিচার হোক।

বিচারের রায় দেয় মোড়লরা। বেশ কয়েক হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং সেই রাতেই তা পরিশোধ করতে বলা হয়। টাকা পরিশোধের জন্য কোনো সময় দেওয়া যাবে না। মোড়লদের গালাগাল দেওয়া, গ্রামের ছেলেদের অধঃপথে নিয়ে যাওয়া, সমাজের নিয়ম-কানুনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখানো এসব অপরাধের কাছে এই কয়েক হাজার টাকা জরিমানা আর সবার সামনে ভুল শিকার করে ক্ষমা চাওয়া এমন কোন বড় বিচার নয়। তবু মোড়লরা গাউসের দিকে তাকিয়ে এমনই রায় দেয়।

রায় শুনে গাউস বলে ওঠে এখন সে টাকা দিতে পারবে না। যখন টাকা হবে তখন দেবে। গাউসের এক ছেলে বলে টাকা নিয়ে বসে নাই। কথায় বেশ ঝাঁঝ। গাউসের আরেক ছেলে বলে ওঠে টাকা না দিলে কি হবে ?

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে ওঠে জনতা। ঘিরে ধরে গাউস আর তার ছেলেদের। তারপর গাউস সহ তার ছেলেদের এক জায়গায় বসিয়ে মোড়লরা বলে আজ রাতেই টাকা আদায় করা হবে। ও যদি বলতো কয়েকদিন দেরি হবে টাকা দিতে, একটু সময় দেওয়া হোক তাকে। আর জরিমানার টাকাটাও একটু কম করা হোক, আমরা কি শুনতাম না। আমরা তো অনেক বিচারে জরিমানা কমিয়ে দিই। কাউকে কাউকে মাফ করেও দিই। দশ যেখানে খোদা সেখানে। দশকে অমান্য করা। এদের এত তেজ কিসের ? তারপর মোড়লরা কয়েকজন গ্রামবাসীকে নিয়ে একটু পরামর্শ করে বলে, যা তো কয়েক জন, ওর গোয়াল থেকে হালের বলদ জোড়া নিয়ে আয়। ওই বলদ কাল বিক্রি করে আমরা জরিমানার টাকা তুলে নেব।

দুড়দাড় করে কয়েকজন ছুটে যায় গাউসের বাড়ি। তার আগে

শীতের মরে আসা দিনের মতো তেজ কমতে থাকে মোড়লদের। আর এই সময় এর সঙ্গে যুক্ত হয় রাজনীতি। রাজনীতির জোরে সব কিছু দখল করে নিতে চায়। বিশেষ করে যারা এতদিন গ্রাম জীবনে কোন ক্ষমতায় ছিল না তারা ক্ষমতা দখলে মরিয়া হয়ে ওঠে। এছাড়া প্রতিটা গ্রামেই কিছু দশালি সম্পত্তি থাকে। সেখান থেকেও বছরে মোটা একটা টাকা আয় হয়। সেই টাকা সামাজিক ভালো ভালো কাজে ব্যয় করা হয়। কিন্তু একদল মানুষ চাইল এই টাকার উপর তাদের দখলদারি কায়েম হোক। খোদা ভীতু, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তৎপর মানুষেরা সমাজের সামনের সারি থেকে ক্রমশ পেছনের দিকে যেতে বাধ্য হয়।

অবশ্য মানুষ জনের চিৎকার চেঁচামেচিতে গ্রাম জেগে উঠেছিল। ভারী রাতে একদল লোক হইচই করতে করতে ছুটে চলে গাউসের বাড়ি। বলদ জোড়া এনে একটি গাছে বাঁধা হয়। গাউস আর তার ব্যাটারা চুপসে যায়।

পাশ থেকে গাউসকে কেউ কেউ শিখিয়ে দেয়, বলে, আরে হারামজাদা এখনো ক্ষমা চা, বল ভুল হয়ে গেছে। শুনলি তো আগামীকাল তোর বলদ জোড়া বেচা হবে। চাষ করবি কিসে? আর তোর ছেলেরা তো বিপথে চলে যাচ্ছে। তোর সংসারে আগুন লেগেছে। সে আগুন গ্রামের ঘরে ঘরে লাগাতে চাচ্ছে। তোর ছেলেদের শাসন করলে তোরই তো মঙ্গল। সেই সঙ্গে গ্রামের মঙ্গল। ক্ষমা চা হারামজাদা।

গাউস আর তার ছেলেরা ক্ষমা চেয়ে নেয়। জরিমানার টাকা কমে যায়। দুই মাস সময় দেওয়া হয়। পাট ঘাস উঠলে এই টাকা দেবে গাউস। একটা নির্দিষ্ট তারিখ ঠিক করে দেওয়া হয়। সেই তারিখের পার করলে পুরো জরিমানা লাগবে এবং আবার বিচার বসানো হবে। ওই তারিখে টাকা না দিলে ধরা হবে সে গ্রামের বিচার অমান্য করেছে।

এই বিচারের ফলে আর সমবেত জনতার চাপে গাউস আর তার ছেলেদের উদ্ধত ফনা সেদিন শুধু মাটিতে মিশে যায় তাই নয় বিষদাঁতও ভেঙে যায়। তারপর থেকে তারা গ্রামের ত্রি— সীমানায় বা মাঠে মদ জুয়া গাঁজার আড্ডা বসাতে সাহস পায়নি।

এই ঘটনা গত শতাব্দীর আটের দশকের গোড়ার দিকে। তখনকার দিনে গ্রামে এই ধরনের বিচার হতো। মোড়লরা সহ গ্রামের মানুষেরা বিচার ব্যবস্থাকে মজবুত রাখত। সকলের প্রয়োজনে, এই বিচার ব্যবস্থাকে, গ্রাম জীবনকে বেঁধে রাখার একটা উপায় হিসেবে মনে করত। সেই সময় সব বিচার যে ন্যায় ও সূক্ষ্ম হতো তা নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভুল ভ্রান্তি হতো। কারো কারো উপর একটু বেশি অন্যায় হয়ে যেত। তবে তা খুব মারাত্মক কিছু নয়।

আমার গ্রামের মানুষ যে তখনকার দিনে থানা পুলিশ কোর্ট কাছারিতে যেত না তাও নয়। সেখানেও যেত। তবে খুব কম। বড় কোন বিষয় ঘটে গেলে, মোড়লরা সামাল দিতে না পারলে মানুষ থানা পুলিশ কোর্ট কাছারিতে অবশ্যই যেতো। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ঝামেলা গ্রামে মিটিয়ে নিতো। একটু বাড়াবাড়ি বিষয় হলেও গ্রামের মোড়লদের উপর ভরসা রাখতো সাধারণ নিরক্ষর মানুষ। থানা পুলিশের ঝঞ্ঝাট, পয়সা খরচ করে কোর্টে হাঁটা পছন্দ করত না। গ্রামীণ সমাজকে একটা ঐক্যের বাঁধনে বেঁধে রাখত এই মোড়লরা; আর এই বিচার ব্যবস্থা।

এই বাঁধন ক্রমশ আলগা হতে থাকে গত শতাব্দীর নয়ের দশকের গোড়ার দিক থেকে। এ সময় দলে দলে যুবক গ্রাম থেকে বাইরের শহরের কাজে যেতে শুরু করে। গোছা গোছা টাকার সঙ্গে শহুরে চালচলন, সেখানকার সংস্কৃতি নিয়ে আসে। কেমন এক আত্মকেন্দ্রিক ভাব। গ্রামের পরিবেশে ঠিক যেন খাপ খায় না। কিছুদিনের জন্য কাজ থেকে বাড়ি এসে কেমন এক বেসুরো খামখেয়ালিপনায় মেতে ওঠে। হাতে পয়সা আর শহুরে মানসিকতা; গ্রাম্য মোড়ল মাতব্বর থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষদের প্রতি কেমন অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পায় তাদের আচরণে।

গ্রামে কোন বিচার হলে, তার রায় উনিশ বিশ হলে তা নিয়ে চায়ের দোকানে তুমুল ঝড় তোলে। মোড়লদের বিরুদ্ধে কিছু কথা বলে। মানুষ শোনে। কখনো প্রতিবাদ করে, কখনো বা

সম্মতি দেয়। মোড়লদেরকে এক বাক্যে মেনে চলার মধ্যে ফাটল ধরে। শীতের মরে আসা দিনের মতো তেজ কমতে থাকে মোড়লদের। আর এই সময় এর সঙ্গে যুক্ত হয় রাজনীতি। রাজনীতির জোরে সব কিছু দখল করে নিতে চায়। বিশেষ করে যারা এতদিন গ্রাম জীবনে কোন ক্ষমতায় ছিল না তারা ক্ষমতা দখলে মরিয়া হয়ে ওঠে। এছাড়া প্রতিটা গ্রামেই কিছু দশালি সম্পত্তি থাকে। সেখান থেকেও বছরে মোটা একটা টাকা আয় হয়। সেই টাকা সামাজিক ভালো ভালো কাজে ব্যয় করা হয়। কিন্তু একদল মানুষ চাইল এই টাকার উপর তাদের দখলদারি কায়েম হোক। খোদা ভীতু, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তৎপর মানুষেরা সমাজের সামনের সারি থেকে ক্রমশ পেছনের দিকে যেতে বাধ্য হয়।

এই সময়ের গ্রামীণ বিচার ব্যবস্থার একটা উদাহরণ রাখছি এখানে। সেদিন শুক্রবারে জুম্মার নামাজের আগে খুৎবার বক্তব্য অন্যভাবে উপস্থাপিত হয়। উপস্থাপন করেন ইমাম সাহেব। প্রথমে মানুষ শুধু ধর্ম উপদেশ শোনে। অন্য ভাবনা মনে উঁকি দেয় না। পরে অন্য কথা আসে, প্রসঙ্গ আসে। ইমাম সাহেব বললেন—কুল্লু নাফসিন জাইএ কা তুল মউত । প্রত্যেক মানুষকে মউতের পেয়ালা চাখতে হবে। মৃত্যু সবাইকে এক চির নিদ্রার জগতে নিয়ে যাবে। যে জগৎ থেকে মানুষ আর কখনোই ফিরে আসবে না। তার ঠিকানা হবে গোরে। সাড়ে তিন হাত জমিনে। সেই জায়গা পাক-পবিত্র থাকা দরকার। গোরস্থানের কিছু হক আছে। হক আছে গোর বাসি নিঝুম জগতের মানুষেরও। যারা শুয়ে থাকে কবর আঁধারে। তারা তো ভাই বড় অসহায়। তারা তো গোরস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করতে পারে না। তা করা দরকার জীবিতদের। তারা কবর থেকে চেয়ে থাকে আমাদের দিকে। আমাদের উচিত সমস্ত গোরস্থানের পবিত্রতা সুন্দরভাবে রক্ষা করা। গোরস্থানের উপর কোন অত্যাচার যেন না হয় তা দেখা।

ইমাম সাহেবের কথার একটা দিক খুঁজে পায় সাধারণ মানুষ। কিন্তু গভীরে যে কথাটা তলায় তলায় গড়াচ্ছিল তা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারেনি জুম্মার নামাজের জন্য সমবেত মুসল্লীগণ। ইমাম সাহেবের কথার তাত্ত্বিক দিক মেনে নিয়ে নামাজ শেষে বাইরে আসে সমবেত জনতা। তারপর সেই কথার বাস্তব দিকের সন্ধান পায় তারা।

মসজিদ থেকে বেরিয়ে জুবায়ের মোড়ল হেঁকে ওঠে। শুধু শুনলে হবে না আমল করতে হবে। শোনার নাম ঈমান নয়, মানার নাম ঈমান। ইমাম সাহেবের কথা যদি মানতে পারো তবে সেই কথা শোনা সার্থক হবে। আমাদের পূর্ব পুরুষরা রক্ষা পাবে। মাটির তলে পড়ে থাকা অসহায় মানুষগুলোর রক্ষা। গলগল করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসা লোকেরা জুবায়ের মোড়লের ভাষণ ঘিরে দাঁড়িয়ে যায়। ঘের বাড়তে থাকে। জুবায়ের মোড়ল কথার ফের না ভেঙে ভাষণ আর একটু বড় করে। তারপর সালাম মোড়ল মসজিদ থেকে বেরুতেই কথার ফের ভাঙে। বলে আমাদের উচিত গোরস্থান রক্ষা করা, পূর্বপুরুষ বাপ দাদাদের কবরের হেফাজত করা। কি ঠিক কিনা ?

জনতার দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দেয়। জনতা একসঙ্গে সম্মতি দেয়। আষাঢ়ের প্রথম মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি। জুবায়ের বলে এখানে যারা একটু আমার মত বয়স্ক আছো তারা বুঝবে আমার কথা। ছেলেমানুষরা নাও বুঝতে পারো। কথাটা হলো হাতিখেলার জায়গাটার। ছেলেমানুষরা হাতিখেলা জায়গা কোনটা তাও হয়তো চেনে না। কিন্তু বড়রা জানে। এখন যেখানে সাবির ঘর করে আছে, গোয়ালবাড়ি, পাটকাঠির গাদা, আউড় পালা দিয়ে আছে, যে জায়গাটার সামনেটা দখল করে সাবিরের ব্যাটারা দোকান করেছে সেটাই হাতিখেলার গোরস্থান।

গোরস্থান ! গোরস্থান ! এই উচ্চারণের রব ওঠে ছেলেমানুষ জনতার মুখে। কেমন সব বিস্ময় বিহ্বল চাহনি। এ কি কথা বলছে জুবায়ের মোড়ল। তা কি করে হয়। ও তো কবে থেকে চটান পড়ে আছে। ফাঁকা জায়গা। সাবির নিজের মতো কাজে লাগায়। নিজের মত করে ব্যবহার। সবাই জানে ও জায়গা সাবিরের।

ছেলেমানুষদের চোখে বিস্ময় থাকলেও বুড়োরা বলে ঠিক কথা, ঠিক কথা। আমরা দিয়েছি কবর। আমরা অনেক মানুষকে কবরে নামিয়েছি ওখানে। এইতো বছর চল্লিশ পঞ্চাশ আগেই। ওটা তো গোরস্থান। ঠিকই তো বটে। ও জায়গা আমাদের রক্ষা করা উচিত।

বুড়োরা তারস্বরে বলে ঠিক ঠিক। জুবায়ের মোড়ল ঠিক বলেছে। আমাদের দেখা গোরস্থান ওটা। জনতা কলকলিয়ে ওঠে। বুড়োরা পাশের নবীনদের হাতিখেলার গোরস্থানের ইতিহাস বলে যেতে থাকে। বুড়োদের বুক খুঁড়ে উঠে আসে পুরনো ইতিহাস। কোন নবীন ছোকরার দিকে তাকিয়ে বলে, আরে তোর পোত দাদো তো ওখানেই শুয়ে আছে। কি

লম্বা-চওড়া মানুষ ছিল। আর তেমনি মরদ। আহা গো তার বুকের উপর এখন সাইকেল চলে। মানুষজন হয়তো পেশাব করে।

নবীন ছুড়াঁ খেপে উঠে। সেই কোন যুগের না দেখা পোতদাদো রক্তের ভিতর ছুটাছুটি শুরু করে। আসর গরম হয়ে ওঠে। শুধু ওই নবীনই নয় আরো কারো কারো দাদো দাদি কিংবা ছোট বয়সে মারা যাওয়া চাচা ফুপু শুয়ে আছে সেখানে। তাদেরই রক্ত, আত্মার অংশ। না জানি তারা কি কষ্টে আছে, কত আজিয়তে আছে। তাদের উদ্ধার করতে হবে।

জনতা বেশ তেতে ওঠে। এবার পরিবেশ বুঝে গর্জে বলে জুবায়ের, ভাইসব ওই জায়গা আমাদের দশালি সম্পত্তি। সাবির জবরদখল করে আছে। এখন আপনারাই দেখুন জায়গা উদ্ধার করবেন না ছেড়ে দেবেন। আপনাদের বাপ দাদোদের গু—মুত খাওয়াবেন।

এবার আর আষাঢ়ের গুরুগুরু নয়, কালবৈশাখীর চড়াম চড়াম। মনে হয় ঝড় উঠবে।

সালাম মোড়ল আসরে নামে। বলে ওই জায়গা আর ওভাবে ফেলে রাখা যাবে না। খুব তাড়াতাড়ি উদ্ধার করতে হবে। আমাদের দশালি সম্পত্তি ওখানে কতটা, তার চৌহদ্দি কেউ যদি দেখতে চাও আমি দেখাতে পারি।

জনতা হৈ হৈ করে ওঠে। বলে এখনই চলো, এখনই দেখব। দুটো মোড়ল আগে আগে চলে আর স্রোতের মতো জনতা পিছন পিছন। তবে নীরবে নয় সগর্জনে এগিয়ে চলেছে তারা। তরুণদের লম্প ঝম্প একটু বেশি।

কেউ কেউ মোড়লদের দোষারোপ করে বলে এতদিন কেন বলেনি। বললে কবে ও জায়গা উদ্ধার হয়ে যেত। পূর্বপুরুষেরা লাঞ্ছনা , কষ্ট থেকে মুক্তি পেত।

মোড়লদের পক্ষ ধরে কেউ কেউ বলে, সে কৈফিয়ত পরে হবে। এখন চলো ওই জায়গা কেমন করে উদ্ধার করা যায় সেই কথা ভাবি।

জুম্মার নামাজ শেষের বিপুল জনতা স গর্জনে গোরস্থান রক্ষার পুণ্য কর্মে এগিয়ে যায়।

বাঁধভাঙ্গা জনস্রোত গিয়ে হাজির হয় হাতি খেলার ময়দানে। এখন আর ময়দান তেমন নাই। তিন দিক প্রায় ঘিরে ফেলেছে বাড়িঘরে। মাঝে কাঠা পাঁচেক জায়গা। সেখানেও ইতস্তত চালাঘর। খানিক খানিক জায়গা ফাঁকা। আগাছায় ঢাকা। আর খানিক খানিক জায়গায় পাটকাঠির গাদা , খড়ের পালা , গরু বাঁধার খোয়াড় বাড়ি। রাজ্য সড়কের পাকা রাস্তা বরাবর দিকটা সবই দোকানপাট। দোকান বলতে চায়ের দোকান, মুদিখানা, পোল্ট্রি মুরগির মাংস বিক্রির দোকান এইসব। জায়গাটার ফাঁকে ফাঁকে পাটকাঠির বেড়া। জনতার চাপে সেই বেড়া ভেঙে পড়ে। পায়ের চাপে সেই পাটকাঠি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়।

বিপুল জনতার হৈ চৈ আর চিৎকার চেঁচামেচিতে সাবিরের বৌ—মারা ঘরের কোণে লুকিয়ে পড়ে। সাবিরের বাড়ির উঠোন থেকে ধরে হাতিখেলা নামক গোরস্থানের টুকরো টাকরা ফাঁকা জায়গায় তিল ধারনের জায়গা নাই। মাঝে মাঝে ফুঁসে ওঠা জনতার চাপে মনে হয় সাবিরের বাড়িঘর দোকানপাট ঝড়ের মুখে খড়ের মতো উড়ে যাবে। কোন কোন উৎসাহী জনতা পাটকাঠির গাদা আটকানো বাঁশ খুঁটি ধরে টানাটানি করে। কেউ কেউ গরু বাঁধা গুঁজ উপড়ে ফেলে। গরুর খাওয়া খোল ভেজানো গামলা নিয়ে কেউ কেউ ফুটবল খেলে। ভিড়ের মাঝে আটকে পড়া দুটো ছাগল পালাবার পথ না পেয়ে নাকি এতজন মানুষ একসঙ্গে দেখে বেবুটি দিয়ে চিল্লাতে থাকে। জোর চিৎকারে তাদের জিভ বেরিয়ে আসে। পেট ফুলে যায়। মানুষ বিরক্ত হয়। আরো বেশি করে তাড়া দেয়। আর তারাও প্রাণান্তকর চিৎকার জুড়ে দেয়। ছাগল দুটির গলার উপর জনতার গলা বাজতে থাকে। গরু মোষের হাটেও বুঝি এমন জাকানি দিয়ে চিৎকার হয় না। আবেগী মানুষের বুক রোষে ফুঁসতে থাকে। তার চিহ্ন ফুটে ওঠে বাড়িঘরে, দোকানপাটের এখানে ওখানে পড়ে থাকা গৃহস্থালির জিনিসপত্রের উপর। কিছু কিছু জিনিস একেবারে পয়মাল হয়। আর কিছু জিনিস কারো কারো পকেটে ঢোকে।

সাবির বা তার ছেলেরা কথা বলার সুযোগও পায় না। স্রোতের তোড়ের মুখে পড়া হাঁসের মতো ভেসে যায় তারা।

একসময় ঝড় থামে। কালবৈশাখীর প্রবল তাণ্ডব সারা হাতিখেলা জুড়ে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকে। চৌহদ্দি দেখাতে গিয়ে সালাম মোড়ল যা দেখায় তাতে করে সাবিরের বাড়িঘর দোকানপাট প্রায় সবই ভাঙ্গা পড়ার জোগাড়। সালাম মোড়ল জনতাকে বোঝায়, সাবিরের কত বড় শয়তানি, কীভাবে গোরস্থান চুরি করে নিয়েছে সে। বাপ দাদোদের কবর দখল করেছে। তার একটা বিচার হওয়া উচিত। সেখানেই সমবেত জনতার রায় নিয়ে সালাম মোড়ল ঘোষণা দেয় যে আগামীকাল সন্ধ্যায় সাবির যেন জায়গার কাগজপত্র নিয়ে মাদ্রাসায় উপস্থিত থাকে। সেখানে তার সালিশ বসবে। এখন আর বিচার

ছয়রদ্দিন মোড়লের বারান্দায় হয় না।

উৎসাহী জনতা বিজয় বাদ্যি বাজাতে বাজাতে ফিরে আসে। করোনা কাল চলছে। করোনার দাপট সবে কিছুটা কমেছে। মানুষজন এখন একটু পথে-ঘাটে হাটে বাজারে যাচ্ছে। তবে ভয়ে ভয়ে। কিন্তু মসজিদে মানুষ যাওয়ার বিরাম নাই। বরং মহামারী এসে মানুষকে যেন আরও বেশি ধার্মিক করে তুলেছে। মানুষ এখন মসজিদ মুখী। পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে ভিড় উপচে পড়ে। যে কোনো কালে ঈদ, কোরবানি ছাড়া নামাজ পড়েনি তার গায়ে বিরাট পাঞ্জাবি, মাথায় টুপি। রাস্তা দিয়ে গেলে মনে হয় খোদার অলি আউলিয়া। বিদেশে যারা কাজে ছিল সবাই এখন বাড়িতে। সেই কাজহীন, জনতা ভর্তি গ্রামে ঘোষণা হয় সন্ধ্যায় সালিশ বসবে। আর সালিশের বিষয়ও বড় উত্তেজনাকর। ফলে পরদিন মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ সন্ধ্যায় কানায় কানায় পূর্ণ। বাইরের রাস্তাও লোকে লোকারণ্য।

আগের দিন নেতিয়ে পড়া সাবির পরদিন সন্ধ্যায় কেমন যেন দৃঢ় পায়ে মাদ্রাসাতে ঢোকে। তার চলার ছন্দে কোন আড়ষ্টতা নেই, ভয় নেই। মোড়লদের সামনে যখন বসে তখন মনে হয় সাবির যেন বাজে পোড়া গাছ নয়, বুক দিয়ে শত ঝড় আটকে দেওয়া বৃক্ষ।

গতকালের পর থেকে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত এই কয়েক ঘণ্টায় গ্রাম তোল পাড়িয়ে উঠেছে। সাবিরের বাড়ি ভাঙচুর করা, জায়গার দখল নিতে যাওয়াকে কেন্দ্র করে গ্রামে বিরুদ্ধ মত গড়ে উঠেছে। গতকালের দুপুরের ধর্মের পাশে গজিয়ে উঠেছে রাজনীতি আর মোড়লদের স্বার্থ। গ্রামে সাবিরের রাজনৈতিক পরিচয় বড় হয়ে ভাসতে থাকে। প্রচার হয় দুটো মরা দলের প্রতিনিধি পায়ের তলায় মাটি ফিরে পেতে ধর্মের নামে লোক ক্ষেপাচ্ছে। সাবিরের বাড়ি দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে। সঙ্গে নিয়েছে ইমাম সাহেবকে। কার ইশারায় ইমাম সাহেব এমন খুৎবা দেয়, সাহস কোথায় পায়? ইমাম সাহেব কে ও ছাড়া হবে না। বেচারা ইমাম সাহেব ভিনদেশী মানুষ। অল্প কিছু বেতন আর দুটো পেটের ভাতের দায়ে মসজিদে পড়ে থাকে। সবার মন জুগিয়ে চলতে হয়। কারো কথায় গোরস্থানের হকের কথা বলায় ফেঁসেছে। তার জানা ছিল না হাতি খেলার পূর্ব ইতিহাস। জানা থাকার কথাও নয়। কারণ দেশেরই মানুষই তো সবাই জানে না।

সাবিরের পক্ষে কিছু তরুণ নেতা আর উঠতি মোড়লদের গলা জোরালো ভাবে বাজতে থাকে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে।

এখন সাধারণত গ্রামে এমন ধরনের বিচার কম বসে। অধিকাংশ বিচারই হয় থানাতে বা পঞ্চায়েতে। গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বার, প্রধান প্রমুখ থাকে এই বিচারের মাথায়। পুরোনো দিনের মোড়লরা আর তেমন ডাক পায় না। আগেকার দিনে মানুষ যাদের উপর ভরসা করতো তারা এখন পিছনের সারিতে চলে গেছে। আগের দিনে কতগুলি মোড়ল ছিল যারা বিচারে বসলেই মানুষের মাথা শ্রদ্ধা ভক্তিতে আপনা আপনি নত হয়ে আসতো। তারা বিচার করলে মানুষ খুশি মনে মেনে নিত। সেই সব মানুষ কোনদিন কোন কারণে বিচার সভায় না থাকলে মানুষ বিচার শুনতে আগ্রহ হারাত। কোথাও যেন কিছু একটু নাই, ফাঁকা ফাঁকা মনে হতো। সেই শ্রদ্ধা, ভক্তি, আস্থা, বিশ্বাস সমাজটাকে ধরে রাখার একটা স্তম্ভ ছিল। শূন্য দশকের পর থেকে সেই স্তম্ভ একটু একটু করে ভেঙে পড়তে শুরু করে। এখন তার কঙ্কালটা কেবল দাঁড়িয়ে আছে।

থানায় বা পঞ্চায়েতে হওয়া বিচার নিয়ে কোন কোন মুরুব্বি মানুষের মুখে শোনা যায় আক্ষেপের সুর। আমাদের গ্রামের নিরক্ষর মোড়লদের বিচার এর থেকে ভালো ছিল রে, এ কেমন বিচার। পঞ্চায়েত বা থানায় গিয়ে যে বিচার হয় তাতে মানুষের মন ভরে না, আস্থা থাকে না। শুধু ভয় থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ ভয়ে সে বিচার মাথা পেতে মেনে নিয়ে বাড়ি আসে।

দিনকাল বদলেছে। বদলেছে বিচার ব্যবস্থাও। মানুষকে বিচার পেতে ছুটতে হচ্ছে দূর দূরান্তে।

সামান্য জায়ে জায়ে ঝগড়া বা ছাগল মুরগি নিয়ে ঝামেলার জন্য তো থানায় বা দূরে যাওয়া যায় না। কোর্ট কাছারিও করা যায় না। তার বিচার গ্রামে হওয়াই ভালো। তাই কিছু বিচার গ্রামে হয়। তবে আগের দিনের মতো বিচারের সেই কৌলীণ্য নাই। দু চারজন মানুষ গিয়ে দিনের আলোতে বসে ছোটখাটো বিষয়ে মীমাংসা করে আসে। এতেও গোল বাঁধে। দুই একজন এমন মোড়ল আছে যারা এক কাপ চা এ নিজেকে বিক্রি করতে পারে।

গ্রামের সালিশি বিচার ব্যবস্থা আজ কলুষিত। বিপন্ন। রাজনীতি, ধর্ম, স্বার্থ সব একাকারে মিশে এক জটিল ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মানুষও বিপন্ন। বড় অসহায়। কোথাও যাওয়ার জায়গা নাই। কোথায় যাবে? কে শুনবে তাদের নালিশ? কে দেবে ন্যায় বিচার? (ক্রমশ)

অথ হনু কথা-র কথা

কলম তরবারির চেয়ে ধারালো, বহু ব্যবহৃত হতে হতে কথাটার শরীরের এখন বেশ একটু জং ধরে গেছে বলে মনে হয়। খুব ভালো হত যদি নতুন করে আজ আবার বাক্যবন্ধটিকে উদ্ধৃত করতে না হতো। কিন্তু হায়, মনের গভীরে অনেক দূর পর্যন্ত তলিয়ে যাওয়ার পরেও যে বিশেষ সুবিধা করা গেল না। তাই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বলতে বাধ্য হতে হচ্ছে, 'অথ হনু কথা'-র শাণিত উচ্চারণের শক্তি যে কোনো মারণাস্ত্রের থেকে কোনো অংশে কম নয়; বরং স্থানে স্থানে অনেক বেশি।

বাতাসে বারুদের গন্ধ অনুভব করা যাচ্ছিল গত শতকের শেষের দিক থেকে। এখন ক্রমে ক্রমে তা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার সন্ততিরা এখন ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। আকাশ বাতাস জুড়ে তাদের অপ্রতিহত প্রাধান্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাওয়া পাওয়া। সামান্য ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়ার যূপকাষ্ঠে আমরা অবলীলায় বলি দিচ্ছি বিরাট বিরাট সব সামষ্টিক স্বার্থকে। এতে সবলিমিয়ে পরিস্থিতি সম্ভাব্যতার বাঁধন ছিঁড়েছে। এখন যে যত মিথ্যা কথা বলতে পারে সে তত প্রতিভাবান, ক্ষমতাবান; যে যত প্রবঞ্চক সে তত মহান। এখন তারাই সবচেয়ে বিপন্ন যারা অনিবার্য এই বাস্তবের পদতলে আত্মসমাহিত হয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। তারা নিয়ত দগ্ধ হচ্ছেন, রক্তাক্ত হচ্ছেন; আর মাঝেমধ্যে এই রক্তের রঙে রঞ্জিত করার চেষ্টা করছেন সেইসব মন ও মননকে, যেখানে বিবেকের দীপ এখনো কমবেশি প্রজ্জ্বলিত রয়েছে। 'অথ হনু কথা' বা এর রূপকার মোস্তাক আহমেদ যেমন।

পচাগলা, দূষিত জায়মান বাস্তব তাড়িত করেছে কবিমনকে। নিদারুণ এক দহন যন্ত্রণায় সতত দগ্ধ হয়েছেন কবি; তারপর যেন ইচ্ছা করেই নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন। এখানে সাবধানতার বুকে পদাঘাত করে শুরু হয়েছে কবি-মনেরপথচলা; তারপর সম্ভাব্য সব বাঁধন ছেঁড়া হয়েছে একে একে—

'কখন যে কী বাণী তাঁর/থালা বাসন মজুত রাখি ঘরে/গো-চোনাতে স্বাদ মিটিয়ে নিই/অন্ধকারে অন্ধ সময় কাটে', 'যে কটা দিন আছি লুটেপুটে নিই তবে/আর যার যাই হোক হনু থাকে দুধে ভাতে/দেবীও বাঁধা পড়েন হনু-রাজপ্রাসাদেতে/সংখ্যা বদল হয় অন্ধ মধ্যরাতে', 'হনুরা কি জানে তারা হনুমান/আয়না কি আছে কারও বাড়িতে/সাধনায় চোখ খোলা দায় তার/মুখটাও ঢেকে যায় দাড়িতে'

—কিছু কিছু উচ্চারণ থাকে যার সাপেক্ষে অতিরিক্ত কিছু বলতে যাওয়া যেন অশোভন হয়ে যায়, যেন মনে হয় যাই কিছু বলা হোক না কেন তাতে এর পবিত্রতা নষ্ট হবে, এও তেমনি। সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতি-প্রকৃতির ন্যূনতম খবরাখবর যারা রাখেন তাদেরও স্পষ্ট প্রতীতি হবে উদ্ধত উচ্চারণের ভেদশক্তি অপরিসীম।—এমন করে তুলির আঁচড়ে ওদের কালো মুখে অতি যত্নে আরও আরও কালোর প্রলেপ লেপে দিতে দ্বিতীয় কেউ সমর্থ হয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই।

এক অর্থে শিল্পী-সাহিত্যিকদের স্থান ঈশ্বরের ঠিক পরেই। ভয়কে জয় করা, প্রলোভনকে পদে পদে দলিতমথিত করার মতো শুদ্ধতর মানবতা-চর্চায় শিল্পী-সাহিত্যিকদের ভূমিকা আজও অমলীন। ব্যতিক্রম যে নেই তা নিশ্চয়ই নয়; বরং ব্যতিক্রমী স্রোতেই এখন ভেসে যাচ্ছি আমরা। সামান্য সামান্য প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় শিল্পী-মনের পা চাটা মনোভাব দেখে দেখে প্রায়শ বমন-ভাব হচ্ছে আমাদের। তবে তার অর্থ এই নয়, অমন সব ঘৃণীত ব্যক্তিত্বরা স্থায়ী ভাবে কলঙ্কিত করতে পারছেন শিল্পের পবিত্র অঙ্গনকে। মেঘ সরে গিয়ে একটা সময়ে যেমন আবার সূর্য ওঠে, উদ্ভাসিত হয় দশদিক; এক্ষেত্রেও তেমনি।—'অথ হনু কথা' পাঠান্তে তেমনি প্রতীতি হয় আমাদের।

'অথ হনু কথা' এর পাঠককে প্রতিষ্ঠিত করে সেই প্রত্যয়-লোকে অতলান্ত, অসীমের দিকে যার নিয়ত অভিসার। দূরন্ত ঘূর্ণাবর্তেও ভেসে যাওয়ার নয় এই উচ্চারণ। আমরা এমন উচ্চরাণের নিরন্তন উদ্বোধন কামনা করি; কবির হাতে, সেইসঙ্গে কবি বন্ধুদের হাতের স্পর্শেও।

'অথ হনু কথা' মুদ্রণ-সৌকর্যে অতি আকর্ষণীয়। সাংস্কৃতিক রুচিবোধ ও প্রত্যয়ী-অবস্থানের সাপেক্ষে 'খসড়া খাতা' কর্তৃপক্ষকে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রেমীদের পক্ষ থেকে কুর্নিশ জানাতেই হয়।—*সাইফুল্লা, বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়*

অথ হনু কথা, মোস্তাক আহমেদ, খসড়া খাতা, ৩০০/-

বই-চর্চা

বাঙালি মুসলমান লেখিকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক চিত্ররেখা গুপ্ত পাঠক-গবেষক মহলে পরিচিত নাম। বাঙালি মেয়েদের লেখাপড়া, লেখালিখি, তাদের সামাজিক ক্ষমতায়ন এসব তাঁর একান্ত চর্চা-ক্ষেত্র। ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট চারটি গ্রন্থ—'প্রথম আলোর চরণধ্বনি', 'উনিশ শতকের বিস্তৃত লেখিকারা—সঞ্চয় ও সংশয়' প্রভৃতি। 'বাঙালি মুসলমান লেখিকা' সেদিক থেকে তাঁর মুকুটে সংযোজিত পঞ্চম পালক।

চিত্ররেখা গুপ্ত প্রণীত উল্লেখিত গ্রন্থগুলির প্রত্যেকটিই নিজস্বক্ষেত্রে অসামান্য। তবু বাঙালি মুসলমান লেখিকা-র অনন্যতা অনস্বীকার্য। আমাদের চর্চা ও গবেষণা ধারায় বাঙালি মুসলমান সমাজ এমনিতেই উপেক্ষিত বিষয়; বাঙালি মুসলমান মেয়েদের অবস্থা তো আরও শোচনীয়। তাদের দিকে কেউ ফিরেও তাকান না সেভাবে।

বাঙালি মুসলমান মেয়েরা নিতান্ত অন্তঃপুরের সামগ্রী; তাদের না আছে বৃহত্তর সামাজিক জীবন, না আছে সাংস্কৃতিক জীবন। এমন দৃঢ় ভাবনা থেকে একটা সময় পর্যন্ত তাদেরকে ধর্তব্যের মধ্যে আনা হত না সেভাবে। বঙ্গের মহিলা কবি ও সমজাতীয় রচনায় স্থান দেওয়া হয়নি একজন মুসলমান মেয়েকেও। এদিকে ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে এমন সব রচনায় স্থান পাওয়ার যোগ্য ছিলেন অনেকেই। আর সবার কথা ছেড়ে দিয়ে শুধু আজিজন্নেসার কথাতেই আসা যাক। তাঁর 'হারমিট' প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে; যা গোল্ডস্মিথের 'The Hermit' কবিতার স্বাধীন অনুবাদ। অনুবাদ এখানে এতই জীবন্ত যে ধরিয়ে না দিলে রচনাটিকে মৌলিক বলে ভুল করা অসম্ভব নয়। তখনও পর্যন্ত জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালি মেয়েদের রচিত রচনার সংখ্যা অতি সামান্য। ইংরেজি থেকে অনুবাদ তো আরও কম। এমন অবস্থায় আজিজন্নেসার গবেষকদের দৃষ্টির বাইরে থেকে যাওয়া দুর্ভাগ্যজনক; খুবই অস্বস্তিকর।

এমন দুর্ভাগ্যের শিকল ছেঁড়ার লক্ষ্যে গবেষক চিত্ররেখা গুপ্তের প্রত্যয়ী ভূমিকায় শ্রদ্ধাবনত হতেই হয়। রয়াল সাইজের ৫১৬ পৃষ্ঠা সমন্বিত বিরাট আয়তনের গ্রন্থ। নমঃ নমঃ করে বাম হাতে পুজো দেওয়ার এতটুকুও লক্ষণ নেই। গভীর প্রজ্ঞা, নিষ্ঠা ও ভালোবাসার ছাপ ছড়িয়ে রয়েছে এর ছত্রে ছত্রে।

১৮৩৪ থেকে ১৯১১ এই সময়কালের মধ্যে বঙ্গদেশে জন্ম দেওয়া ত্রিশ-চল্লিশ জন মুসলমান মেয়ের সাহিত্যকৃতির প্রামাণ্য উপস্থাপন রয়েছে এখানে। সঙ্গতভাবে সবার প্রথমে এসেছে ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী (১৮৩৪-১৯০৩)-র কথা। তাঁর রচিত রূপজালাল (১৮৭৬) বাঙালি মেয়েদের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ; স্বর্ণকুমারী দেবীর দীপনির্বাণ-এরও আগে প্রকাশিত হয়েছিল এটি। ফয়জুন্নেসার পরে ক্রমান্বয়ে স্থান করে দেওয়া হয়েছে তাহেরণ নেছা, খায়রুন্নেসা, সারা তায়ফুর প্রমুখকে। রয়েছেন রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন, সুফিয়া কামালের মতো প্রখ্যাত জনেরাও। মুসলিম মেয়েদের লেখালিখি সম্পর্কিত যে বিস্তৃত তথ্য এখানে পরিবেশিত হয়েছে তার তুল্য দৃষ্টান্ত এ বাংলা ও বাংলা মিলিয়ে আছে বলে আমাদের জানা নেই। এই গবেষণাকর্ম আক্ষরিক অর্থেই অনন্য। যেসব উৎসকে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে তার সহজলভ্যতা ছিল না কোনোদিনই। অতি যত্নে প্রতিবন্ধকতার সিঁড়ি ভেঙেছেন গবেষক।

শধু তথ্যের সমন্বয় ঘটানো নয়, দেশ-কালের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত তথ্যের চুলচেরা বিশ্লেষণ গবেষণার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বিষয়। আর সেদিকে লেখকের সচেতনতা প্রশ্নাতীত। গ্রন্থটি বিন্যস্ত হয়েছে ভূমিকা ও উপসংহার সহ অতিরিক্ত চারটি অধ্যায়ে। প্রথম অধ্যায়—'ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে বিবর্তন ও বাংলার মুসলমান' বিশেষ করে অলঙ্কৃত করেছে অপরাপর অধ্যায় সমূহকে। চতুর্থ অধ্যায় 'মুসলমান লেখিকাদের লেখায় নারীর ক্ষমতায়নের স্বপ্ন' খুবই আকর্ষণীয়। মেয়েদের স্বাধিকার এখন বহুল আলোচিত ও আলোড়িত বাস্তব। সেদিক থেকে এই সংযোজন তাৎপর্যপূর্ণ।

'বাঙালি মুসলমান লেখিকা' প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্য সংসদ প্রকাশনা সংস্থা থেকে। কর্তৃপক্ষের যত্নের ছাপ ছড়িয়ে রয়েছে বইটির শরীর জুড়ে। স্থানে স্থানে সামান্য বিচ্যুতি যে নেই তা নয়। এমন সীমাবদ্ধতাকে সহজাত বলে স্বীকার করে নেওয়া শ্রেয়। *—জাহির আব্বাস, ওন্দা থানা মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া*

বাঙালি মুসলমান লেখিকা—চিত্ররেখা গুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, ৭৫০/-

বই-চর্চা

নিরীক্ষণ : সাহিত্য ও সংস্কৃতি

নামেই পরিচয়। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষোলোটি প্রবন্ধ-নিবন্ধের সংকলিত রূপ। ষোলোটি প্রবন্ধকে ভাগ করা হয়েছে চারটি ভাগে। প্রথমভাগে রয়েছে সাতটি রচনা। এর মধ্যে 'ঔপনিবেশিক ঝড় : শেকসপীয়রের দ্য টেম্পেস্ট' এবং 'ডোরিস লেসিং-এর উপন্যাস : উত্তরণের পথ নির্দেশ' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ভাগে অন্তর্ভুক্ত অপরাপর রচনাগুলির মধ্যেও কোনো কোনোটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই সেদিন পর্যন্ত শেকসপীয়রের অনন্য সৃষ্টি 'টেম্পেস্ট' এর অনুপম কাব্যসৌন্দর্য-সুধা আস্বাদ করে বিমোহিত হতেন তাবৎ বিশ্বের সাহিত্যপ্রেমী সমাজ। এর ভিতরকার সত্যকে সেভাবে তলিয়ে দেখার দায় স্বীকার করেননি কেউই। কিন্তু এখন অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। উপনিবেশ ও ঔপনিবেশিকতার আগুনে সেঁকে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে অনেক কিছুকে; টেম্পেস্ট-ও বাদ যায়নি তার থেকে; আর তাতেই হয়েছে হাজারও বিপত্তি; ঘুচে গেছে কাব্যরস আস্বাদের মোহ। এক বীভৎস বাস্তবতার আঘাতে আহত হয়েছে পাঠক-মন; অতঃপর চলেছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। প্রাবন্ধিকও তাঁর মতো করে সচেষ্ট হয়েছেন—'...এইসব মানুষদের গায়ের রঙ, সামাজিক রীতিনীতি, রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইউরোপীয়দের থেকে ছিল আলাদা,...আলাদা বলেই ইউরোপীয়দের চোখে এরা ছিল খারাপ, বর্বর, অসভ্য, নরখাদক, দৈত্য, শয়তান, ভূতপ্রেত, ডাইনি। তাই এইসব ভূমিপুত্রদের নিজের দেশের জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কোনো অধিকার থাকার প্রশ্নই ওঠে না যেন। ঈশ্বর যেন এই 'কুমারী মহাদেশ'কে, এই নতুন ইডেনকে ইউরোপীয়দের ভোগের জন্যই দান করেছেন, এই হল তাঁদের বিশ্বাস।' চমৎকার উপস্থাপন। এর ভাষাগত চারুত্ব, শব্দ ব্যবহার আলাদা করে আমাদের ভালোলাগাকে শিহরিত করে; জানা বিষয়কে নতুন করে জানতে ইচ্ছা হয়।

দিন যত অগ্রসর হচ্ছে আলোচনার আসরে তত বেশি করে চর্চিত হচ্ছেন রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন, বিশেষত মেয়েদের স্বাধিকার কেন্দ্রিক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি। রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন' এখন বিশ্বজনীন আলোচিত নাম। বহুল আলোচিত এই রচনাকে নিজের মতো করে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন প্রাবন্ধিক—'নারীপ্রগতি সম্পর্কে রোকেয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে যে স্বদেশাভিমান, আত্মমর্যদাবোধ, এবং স্বচ্ছ ও আধুনিক চেতনা আছে, তা আমাদের বিস্মিত করে।...'সুলতানার স্বপ্ন'-এ রোকেয়া নারীজীবনের শক্তি ও সম্ভাবনা নিয়ে তাঁর বিশ্বাসকে প্রজেক্ট করেছেন।' সত্যিই তাই, সুলতানার স্বপ্ন মেয়েদের ক্ষমতায়ণের লক্ষ্যে আপোষহীন অবস্থানে উপনীত হওয়া রোকেয়ার গভীর চিন্তনের অনন্য বিচ্ছুরণ।

একটু অন্য ধরণের রচনা 'রুশ আকারবাদী সাহিত্যতত্ত্ব'। এখানে লেখকের অধীত বিদ্যা ও দৃষ্টিভঙ্গির নিজস্বতা সুস্পষ্ট—'আকারবাদীরা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না, একথা ঠিক নয়। ট্রটস্কি টিনিয়ানভ ও আইকেনবাউমের কথা বিশেষ উল্লেখ করেননি। অথচ তাঁরা "বিকাশের গতিসূত্রকে" উপেক্ষা করেননি। ট্রটস্কি যেসব প্রশ্ন তুলেছিলেন, টিটিয়ানভ তাঁর "সাহিত্যের বিবর্তন" প্রবন্ধে সেগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করেছিলেন। অন্যদিকে আইকেনবাউম ১৯২৯ সালে তাঁর একটি প্রবন্ধে স্তালিনপন্থীদের প্রায় সংঘবদ্ধ আক্রমণের উত্তর দেবার শেষ চেষ্টা করেছিলেন।"

চতুর্থ পর্বে সংকলিত রচনাগুলি মুখ্যত পুস্তক সমালোচনা। পুস্তক সমালোচনার বাধ্যবাধকতাকে স্বীকার করে নিয়ে যথাসম্ভব চমৎকারিত্ব আনয়ন করা হয়েছে— 'একমাত্রিক পরিচিতি ও হিংস্রতার সম্পর্ক তিনি অসংখ্য তথ্য ও যুক্তি দিয়ে আলোচনা করেছেন। একে প্রতিহত করার জন্য যুক্তি ও নির্বাচন করার ক্ষমতার ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন। যুক্তির সম্ভাবনায় অমর্ত্য সেনের প্রবল আস্থা। এই পোস্টমডার্ণ ও পোস্ট-স্ট্রাকচারালারলিস্ট তত্ত্বের নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণের কালেও অমর্ত্য সেনের ইতিহাস নির্ভর মানবতাবাদী যুক্তির ক্ষমতায় আস্থা বেশ ভরসা জোগায়।'

বিছিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে লেখা প্রবন্ধ-নিবন্ধের সংকলন। ফলত কমবেশি সংহতির অভাব রয়েছে। এই সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে নিলে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক এক একটি রচনা হিসাবে সংকলিত প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলির অনন্যতা অনস্বীকার্য।—*মামুদ হোসেন, গবেষক, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়*

নিরীক্ষণ : সাহিত্য ও সংস্কৃতি, আমজাদ হোসেন, উদার আকাশ, ৯০/--

পত্রিকা-চর্চা

অনুপ্রাস : বাংলা ভাষা ভাবনা

'অনুপ্রাস' পত্রিকাগোষ্ঠী বাংলা ভাষা বিষয়ে তাঁদের বিশেষ ভাবনার জাল বিছিয়ে চলেছেন। প্রকাশিত হয়েছে 'বাংলা ভাষার ইহকাল পরকাল-২'। সুচিন্তিত, সুবিন্যস্ত, সুদৃশ্য একটি সংখ্যা। সংকলিত হয়েছে চব্বিশটি স্বতন্ত্র ভাবনানির্ভর প্রবন্ধ-নিবন্ধ। সংকলিত রচনাগুলিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে 'চিন্তা রাষ্ট্র সমাজ ও ভাষা', 'সাহিত্য শিল্প কলা ও ভাষা', 'ভূমি ভাষা বিভাষা উপভাষা ভাষা-আন্দোলন' এই তিন পর্বে। বোঝা যাচ্ছে, ভাবনার গভীরে অন্তর্লীন রয়েছে আরও অনেক ভাবনা। প্রাবন্ধিকরা বিশেষ দায়িত্বশীল হয়েছেন সম্পাদকমণ্ডলীর ভাবনার রূপায়ণে।

প্রথম রচনা 'ফুলের ভাষা যদি বুজি'। নামটা একটু বেশি রোমান্টিক। এক্ষেত্রে রোমান্টিরতার পর্দা সরিয়ে নিলে বক্তব্যের যে রূপটা দৃশ্যমান হয় তার অংশ বিশেষ—'বিশ্বায়ণ উত্তর সমাজে শ্রেণিবৈষম্য ও শ্রেণিতে শ্রেণিতে বিচ্ছিন্নতা আরও ভয়াবহভাবে চওড়া হয়ে গেছে, শ্রেণি-আধিপত্য ক্রমশ ভারি হয়ে চেপে বসেছে আমাদের উপর। এই 'যুদ্ধ পরিস্থিতি'-তে ভাষাও একরকম 'আক্রান্ত'-এর দলে।' ভাষা কোনো অধিসৌধ ধর্মী বিষয় নয়, এর সবটাই সমাজবাস্তবতার গভীর থেকে উৎসারিত; একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভাষার যে বহুমাত্রিকতা, এর ভিতরকার টানাপোড়েন তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ রয়েছে এই পর্বে অন্তর্ভুক্ত আরও সব রচনায়—'মানুষের ভাষা শুধু ধর্মের কারণেই বদলে গেছে এমন নয়। জীবনযাত্রার ধরণ, জীবিকা নির্বাহের উপায়, অর্থাৎ, উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন, সংস্কৃতির বিবর্তন জনিত কারণেও ভাষা বিবর্তিত হয়েছে। মানুষ যতদিন শুধু পশুপাখি শিকার ও ফলমূল সংগ্রহ করে খাদ্য সংস্থান করেছে ...'। একটা জাতির জাতীয়তা, তার বিকাশ, শ্রীবৃদ্ধি এসব কিছুই যে ভাষা নির্ভর সত্য তাও প্রতিবিম্বিত হয়েছে এখানে—'...আধুনিক সময়, বিষয় ও সমস্যাকে অনুধাবন করার জন্য আমাদের কোনো ভাষা নেই। যা আছে তা আমাদের কথ্য ভাষা, সাহিত্যের ভাষা, বিনোদনের ভাষা, গানের ভাষা ও আরও যা যা কিছু, কিন্তু আমাদের বিজ্ঞানের ভাষা নেই, সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির ভাষা নেই, রাষ্ট্র চালাবার ভাষা নেই।'

দ্বিতীয় পর্বে অন্তর্ভুক্ত রচনা সমূহে সাহিত্য ও ভাষার অন্তঃ সম্পর্কের দিকটি বিশ্লেষিত হয়েছে বেশি বেশি করে—'কলকাতা অঞ্চলের কথ্যভাষার ছাঁচে লেখা হুতোমের কাহিনিগুলিতে ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। সাধুভাষার অকারণ মিশ্রণে ভাষাকে ভারাক্রান্ত না করে কালীপ্রসন্ন তাঁর নক্‌শায় উপভাষা-ঘেঁষা এমন এক কথ্যভাষা ব্যবহার করলেন যা সরসতায় অনন্য।' বাংলা ভাষা, বিশেষত গদ্য ভাষাকে পথ হাঁটতে হয়েছে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে। এই ঘাত প্রতিঘাতেরই আভাস রয়েছে এখানে। ভাষাশৈলীর স্বরূপ বিশ্লেষণের নিরিখে এই তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ— 'কোনও বিষয় কিংবা বস্তুকে ভাষার অন্তর্গত কোনও শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করলে তবে সেই শব্দের অস্তিত্বে সেই বিষয় বা বস্তুর 'বাস্তব অস্তিত্ব'-এর 'ভাব অস্তিত্ব' তৈরি হয়। শব্দের সঙ্গে শব্দের মিলনে তৈরি ভাষায় উদ্ভূত ভাবসমাজের সহজাত উৎপাদন।'

তৃতীয় পর্যায়ে প্রচলিত রীতির ঘনিষ্ঠ অনুবর্তন রয়েছে। উপভাষা-বিভাষা-সমাজভাষা প্রভৃতির মানদণ্ডে এক একটি অঞ্চলের কিংবা কোনো কোনো সমাজের ভাষাকে বিচার করে দেখা হয়েছে। শুভেন্দু জানার সুন্দরবনের ভাষা যেমন—'সুন্দরবন অঞ্চলের বিভাষার ধ্বনিযোগ অর্থাৎ ধ্বনির আগম একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ... এখানকার মানুষজন শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত্যে স্বরের প্রচুর প্রয়োগ ঘটান।' দেশভাগের প্রেক্ষিতে বাংলা ভাষার শরীরে নানা ভাঙা গড়া হয়েছে। এই ভাঙাগড়ার ইতিকথা বর্ণিত হয়েছে সুচারুভাবে—'...পূর্ববঙ্গের মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়ে পূর্ব থেকেই বসবাসকারী নদিয়ার মানুষের ভাষা উদ্বাস্তুদের বঙ্গালীর প্রভাবে, কখনও বাংলাদেশের কিছু আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে।'

নিঃসন্দেহে অনুপ্রাস 'বাংলাভাষার ইহকাল পরকাল-২' প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। পত্রিকার পূর্ববর্তী সংখ্যা ছিল বাংলা ভাষা ভাবনা মূলক, পরবর্তী সংখ্যাও পরিকল্পিত হয়েছে অনুরূপ রূপে। বাংলা ভাষার জন্য এই দরদ আলাদা করে ভালোলাগার।

—এটিএম সাহাদাতুল্লা, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ইভিনিং কলেজ

অনুপ্রাস, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংকলন, ১৪২৯, ৭০০/-